কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত
কলিকাতা গেজেট, ২৭।১১।৪১

মহাভারতের কথা

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'মহাভারতে'র কথার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে ইহার প্রবর্ত্তক স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক ইহার উত্তরসাধক শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ গ্রন্থখানিকে 'সপ্লিমেণ্টারী' পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। আশা আছে, আগামী বর্ষের নির্ব্বাচনে তাঁহারা বঙ্গের দুই জন কৃতবিদ্য সাহিত্যিকের কঠোর পরিশ্রম-প্রসূত—ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই বহুপ্রশংসিত গ্রন্থখানিকে (*Rapid Reading*) গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাদের পরিশ্রম সার্থক করিবেন।

যে সকল সাময়িক পত্র গ্রন্থখানির নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া ইহার প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন এবং অযাচিত ভাবে যাঁহারা প্রশংসা লিপি পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
বৈশাখ, ১৩৪৯

শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ
প্রকাশক

ভূমিকা

'মহাভারতের কথা অমৃতসমান।'—বাঙ্গালার অমর কবি কাশীরাম দাস এক কথায় মহাকাব্য মহাভারতের যে প্রশস্তি গাহিয়াছেন, ইহার উপরে আর কথা নাই; মহাভারতের এমন সহজ সরল সংজ্ঞা আর কোন কবিই দিতে পারেন নাই। মহাভারতের অমৃতসমান কথা ও কাহিনী মহাভারতের পাত্রপাত্রীগণের চরিত্রালোচনা সম্পর্কে প্রকাশিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

মহাভারতীয় চরিত্ররাজি অবলম্বন করিয়া একখানি গ্রন্থ রচনার আগ্রহ আমার বহুদিন হইতেই ছিল; কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ আর ঘটিয়া উঠে নাই। ঘটনাচক্রে আমার পরম স্নেহভাজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীযুত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একান্ত আগ্রহ সহকারে এ বিষয় আমাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, আমি সানন্দে এই গুরুভার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করি।

উভয় পক্ষের তিন মাস ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর 'মহাভারতের কথা' সমাপ্তির আনন্দ আজ এই রুগ্ন অবস্থায়ও আমাকে অভিভূত করিতেছে। ইম্পীরিয়েল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণ আমার সহকর্ম্মী মণিলাল বাবুকে এই গ্রন্থ-সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্করণের মহাভারত ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থসমূহ পরিদর্শনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিদ্যালয়ের বালকবালিকারা যাহাতে অসঙ্কোচে মহাভারতের কথা পড়িতে পারে এবং পড়িয়া বিরাট মহাভারতের বিষয়বস্তু সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, গ্রন্থ রচনায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এখন ইহা জনাদৃত হইলেই আমাদের কঠোর পরিশ্রম সার্থক হইবে।

ইতি—

৫ই বৈশাখ ১৩৪৭

শ্রীসুধাংশুভূষণ [illegible]

সূচী পত্র

পুরুষ-চরিত্র

স্ত্রী-চরিত্র

মহাভারতের কথা

শ্রীকৃষ্ণ

মহাভারতের কথায় তথা ভারতের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণ যে প্রাণস্থানীয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, রাষ্ট্র-বিপ্লব, ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, নীতি-বিপ্লব প্রভৃতি বিভিন্ন বিপ্লবের আবর্ত্তে পতিত ভারত-তরণীকে মহাবিচক্ষণ কর্ণধারের মত তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাভারতের কথায় শ্রীকৃষ্ণের মুখেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রথম যৌবনের যে অসামান্য বীরত্বের পরিচয় পাই—তাহা মাতুল কংসকে বধ করিয়া মাতামহ উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার উপাখ্যান! সভাপর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞের আলোচনা সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই আখ্যান শুনাইতেছেন—

> কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য কংসো নির্ম্মথ্য যাদবান্।
> বার্হদ্রথস্থতে দেব্যাবুপাগচ্ছদ্বৃথামতিঃ ॥
> অস্তিঃ প্রাপ্তিশ্চ নাম্না তে সহদেবানুজেঽবলে।
> বলেন তেন স্বজ্ঞাতীনভিভূয় বৃথামতিঃ ॥
> শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তঃ স তস্যাসীদতীবাপায়নো মহান্।
> ভোজরাজন্যবৃদ্ধৈশ্চ পীড্যমানৈর্দুরাত্মনা ॥

জ্ঞাতিত্রাণমভীপ্সদ্ভিরস্মৎসম্ভাবনা কৃতা।
দত্ত্বাক্রূরায় সুতনুং তামাহুকসুতাং তদা॥
সঙ্কর্ষণদ্বিতীয়েন জ্ঞাতিকার্য্যং ময়া কৃতম্।
হতৌ কংসসুনামানৌ ময়া রামেণ চাপ্যুত॥

স, প, ১৪ অ, ৩০—৩৪

অর্থাৎ—কিছুকাল অতীত হইলে, মূঢ়মতি কংস বৃহদ্রথনন্দন জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়ের সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া যাদবদিগকে পীড়ন করিতে থাকে। ঐ কন্যাদ্বয় জরাসন্ধপুত্র সহদেবের কনিষ্ঠা সহোদরা, তাহাদের নাম অস্তি ও প্রাপ্তি। জরাসন্ধের সহিত সম্বন্ধবন্ধন হওয়ায় তাহার প্রভাবে কংস জ্ঞাতিদিগকে পরাভূত করিয়া প্রধান্য লাভ করে। এবং ভোজবংশীয় বৃদ্ধ রাজন্যবর্গের উপর কঠোর অত্যাচার করিতে থাকে। আমি ঐ সময় আহুকদুহিতা সুতনুকে অক্রুর হস্তে সম্প্রদান করি এবং উৎপীড়িত জ্ঞাতিদিগের পরিত্রাণকল্পে বলদেবের সাহায্যে কংস ও সুনামাকে সংহার করি।

ইহার পর এই সভাপর্ব্বের অর্ঘ্যাভিহরণ অধ্যায়ে বৃন্দাবন ও মথুরা সম্পর্কে আমরা ইহার আরও স্পষ্টতর প্রমাণ পাই।

রাজসূয় যজ্ঞসভায় ভীষ্মের নির্দ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকেই প্রধান পুরুষ স্থির করিয়া অর্ঘ্য প্রদত্ত হইলে কৃষ্ণবিরোধী শিশুপাল তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়া প্রতিবাদ করিলেন। ভীষ্ম ইহার উত্তরে কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন করিয়া কহিলেন—আমি বহু জ্ঞানবৃদ্ধ সাধুপুরুষদের নিকট সর্ব্বগুণাধার কৃষ্ণের অনেক প্রকার গুণের কথা শুনিয়াছি। কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল অনন্যসাধারণ কর্ম্ম করিয়াছেন, আমি তাহা অবগত আছি। কৃষ্ণের শৌর্য্য-বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইয়াই তাঁহাকে অর্ঘ্য দিয়াছি।

শিশুপাল ইহার যে প্রত্যুত্তর দিলেন, তাহা এইরূপ—কৃষ্ণ বাল্যকালে শকট-ভঞ্জন, গোবর্দ্ধন-ধারণ, স্তূপীকৃত-অন্নভোজন, শকুনি পূতনা অশ্ব ও বৃষভ এবং কংস বধ করিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? চেতনা শূন্য কাষ্ঠময় শকট পাদদ্বারা নিক্ষেপ করা কি এমন কঠিন কর্ম্ম? বল্মীকপিণ্ডবৎ গোবর্দ্ধন সপ্তাহকাল ধারণ করাই বা এমন কি বিস্ময়কর? পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে ঔদরিক কৃষ্ণ রাশীকৃত অন্নভোজন করায় মুগ্ধস্বভাব গোপবালকগণই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে পারে। পূতনা এক জন নারী, অশ্ব ও বৃষভ বনের পশু—ইহাদিগের বধে বলবত্তার পরিচয় কি আছে? আর এই দুরাত্মা কৃষ্ণ বলবান কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে বলিয়াই কি তাহার শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রশংসা করিতে হইবে?

শিশুপালের এই উক্তি হইতেই আমরা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার পরিচয় পাই। এই উক্তি প্রসঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দুরাত্মা, স্ত্রীঘাতক, অন্নদাতার নিধনকারী প্রভৃতি বলিয়া কত অকথ্য গালিই দিলেন। বস্তুতঃ প্রতিদ্বন্দ্বীর দোষোদ্ঘাটনে নানারূপ বিরুদ্ধ কল্পনার আশ্রয়ে অসূয়া প্রকাশ প্রতিপক্ষের স্বাভাবিক। ভীষ্ম ও শিশুপালের উত্তর প্রত্যুত্তর হইতে আমরা শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে এই ধারণা উপলব্ধি করিতে পারি যে, শৈশবে অসামান্য শারীরিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া তিনি ব্রজবাসিগণকে যেমন চমৎকৃত করিয়াছিলেন, শৈশবান্তে মথুরায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতে করিতেও তিনি তদ্রূপ নানারূপ অলৌকিক লীলার অবতারণা করিয়াছেন। ইহার মূলেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিল। কৃষ্ণের মাতুল কংস কৃষ্ণের মাতামহ উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া রাজ্যময় অত্যাচারস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব এবং জননী দেবকীদেবীও স্বাধীনতা হারাইয়া

বন্দিজীবন যাপন করিতেছেন, নানারূপ অনাচার অত্যাচার ও অহিতাচারে ধর্ম্মনিষ্ঠ সুধীবৃন্দ ত্রস্ত। প্রতিকারকামী কৃষ্ণ এই সময় ভ্রাতা বলরামের সহিত শক্তিবৃদ্ধি ও সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবামাত্রই কংসকে সংহার করিয়া তাঁহার রাজত্বের উচ্ছেদ করিলেন এবং রাজসিংহাসনে মাতামহ উগ্রসেনকে অভিষিক্ত করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

কিন্তু কংসের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শ্বশুর ও পরম পৃষ্ঠপোষক মগধপতি জরাসন্ধ এমন নিরবচ্ছিন্ন সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন যে, মথুরায় থাকিয়া সুশৃঙ্খলে রাজ্য-পরিচালনা যাদবগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ মথুরায় বিপুল সামরিক অভিযান পাঠাইয়া জরাসন্ধ যাদবগণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, শত্রুনাশন মহাস্ত্রসমূহদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রান্ত ভাবে প্রহার করিলেও জরাসন্ধের বিপুল বলক্ষয় সম্ভবপর নহে। এই জন্যই অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে যাদবগণ মথুরার বিপুল ঐশ্বর্য্য পৃথক পৃথক বিভাগ দ্বারা সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া পরিজনবর্গ, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত পশ্চিম দিকে প্রস্থান করেন। তথায় সুপ্রসিদ্ধ রৈবতক শৈলাশ্রিত দুর্ভেদ্য দুর্গরাজিসমন্বিত দ্বারকায় যাদবদিগের নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই এই মহানগরীর পরিচয় প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, ইহা দেবতাদিগেরও অগম্য, তথায় স্ত্রীগণও অনায়াসে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক নগরী রক্ষা করিতে পারে, মহারথ যাদবদিগের ত কথাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রধান প্রধান যাদব বান্ধবগণের সহিত যখন পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় উপনীত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণ মধ্যে পাঁচজন অসাধারণ ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দর্শন করিলেন, তখন তাঁহাদের

সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল এবং তাঁহাদিগকেই তিনি পঞ্চপাণ্ডব বলিয়া অনুমান করিলেন।

যথা—

> দৃষ্টা তু তান্ মত্তগজেন্দ্ররূপান্ পঞ্চাভিপদ্মানিব বারণেন্দ্রান্॥
> ভস্মাবৃতাঙ্গানিব হব্যবাহান্ কৃষ্ণঃ প্রদধ্যে যদুবীরমুখ্যঃ!
> শশংস রামায় যুধিষ্ঠিরং স ভীমং সজিষ্ণুঞ্চ যমৌ চ বীরৌ।
> শনৈঃ শনৈস্তান্ প্রসমীক্ষ্য রামো জনার্দ্দনং প্রীতমনা দদর্শহ॥
>
> আঃ, পঃ, ১৮৭ অঃ, ৭—৯

অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্রাহ্মণবেশধারী তেজঃপুঞ্জ-কলেবর পঞ্চ সুপুরুষকে জনসাধারণের মধ্যে উপবিষ্ট দেখিয়াই সন্দিগ্ধ হইলেন। পরক্ষণেই তিনি তাঁহাদিগের প্রতি বলরামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিলেন যে, সম্ভবতঃ ইঁহারাই যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুনাদি পঞ্চপাণ্ডব। বলরামও তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃষ্ণের অনুমান-সমর্থন করিলেন। তখনই তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন যে, পঞ্চপাণ্ডব বারণাবতের জতুগৃহদাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া স্বয়ম্বর-সভায় ছদ্মবেশে বিরাজ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিলে রাজা দ্রুপদ যখন তাঁহার হস্তে কন্যাসম্প্রদানে উদ্যত হইলেন, সে সময় সমবেত ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ 'ক্ষত্রিয়বাঞ্ছিত স্বয়ম্বরা-কন্যাকে কোন ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিতে পারেন না'—এই যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক যখন যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণই রাজগণকে সম্বোধন করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে নির্দ্দেশ দেন—হে নৃপতিগণ! ব্রাহ্মণকুমার ধর্ম্মত এই রাজকন্যাকে লাভ করিয়াছেন; সুতরাং আপনারা নিরস্ত হউন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

ইতিমধ্যেই ব্রাহ্মণবেশী ভীমার্জ্জুনের অসাধারণ শৌর্য্যের পরিচয়

পাইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে শান্তিস্থাপনে ব্রতী দেখিয়া রাজন্য-সমাজ নিরস্ত হইলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিলেন, ব্রহ্মবিদ্যাবলে এই ব্রাহ্মণকুমারদ্বয় এভাবে অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছেন।

দ্রৌপদীকে লইয়া পঞ্চপাণ্ডব যখন নগরোপকণ্ঠে কুম্ভকারগৃহে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদী-বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যস্ত হইয়াছেন, সেই সময় তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তথায় উপনীত হইলেন। কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিয়া পঞ্চপাণ্ডব চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে কহিলেন,—আমরা দুই ভাই আমাদের পিতৃষ্বসার চরণবন্দনা করিতে আসিয়াছি। আমি বসুদেবপুত্র কৃষ্ণ, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ বলরাম।

রাম-কৃষ্ণকে এভাবে পাইয়া পাণ্ডবগণ অতিশয় হৃষ্টচিত্তে প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাম-কৃষ্ণও পিতৃষ্বসার চরণবন্দনা করিয়া তাঁহার পুত্রগণের সৌভাগ্য আলোচনায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। যুধিষ্ঠির এই সময় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—আমরা যে এখানে এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছি, আপনারা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?

শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর দিলেন—অগ্নি প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অনায়াসেই প্রকাশ পায়। পাণ্ডব ব্যতীত স্বয়ম্বরসভায় এমন পরাক্রম প্রকাশ আর কাহার পক্ষে সম্ভব? আমাদের ভাগ্যবলেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়াছে—তোমরা জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ। তোমাদের প্রণষ্টপ্রায় মঙ্গল পুনরায় সমুজ্জ্বল হউক। পাণ্ডবদিগকে এইভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া রাম-কৃষ্ণ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পাণ্ডবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই প্রথম আলাপ পরিচয় এবং সম্প্রীতির সূচনা।

পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ অনুষ্ঠানের পর শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগের জন্য প্রচুর ধনরত্ন, যানবাহন, দাসদাসী, শয্যা প্রভৃতি যৌতুক-স্বরূপ প্রেরণ করেন এবং স্বয়ম্বরসভার সময় হইতে পাণ্ডবদিগের প্রকাশ ও হস্তিনার রাজ্যাংশপ্রাপ্তির ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত পাঞ্চাল নগরেই থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চপাণ্ডবের পরম বান্ধব জানিয়া পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডব-প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য বিদুরকে দূতরূপে প্রেরণ করিলে, রাজা দ্রুপদ বলেন যে, যিনি সর্ব্বদা পাণ্ডবদিগের হিতানুষ্ঠানে রত, সেই শ্রীকৃষ্ণের এ সম্বন্ধে যে মত হইবে, আমারও সেই মত। তিনি আমাদিগকে যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব। নিজের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে পরিচয়ালাপের সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা হইতে পারিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ যখন সেই পরামর্শসভায় পাণ্ডবগণের হস্তিনায় গমন বিধেয় বলিয়া যুক্তি দিলেন, সর্ব্বসম্মতিক্রমেই তাহা স্বীকৃত হইল এবং হস্তিনাযাত্রায় পাণ্ডবদিগের সহিত পাণ্ডববন্ধু শ্রীকৃষ্ণকেও সহযাত্রী হইতে দেখা গেল।

হস্তিনায় কয়েকদিন অবস্থিতির পর অর্দ্ধরাজ্যভোগের অনুমতি পাইয়া পাণ্ডবগণ যখন অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে উপনীত হইলেন তখনও শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের সাথী। এই সময় অর্জ্জুনের সহিত তাঁহার অখণ্ড সৌখ্য স্থাপিত হয়। খাণ্ডবপ্রস্থ রাজধানীর উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত ও যুধিষ্ঠির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করেন।

কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ শুনিলেন যে, নিয়মভঙ্গের অপরাধে অর্জ্জুন প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দ্বাদশ বৎসর বনবাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি

অমনই রৈবতক পর্ব্বতে উৎসবের আয়োজন করিয়া প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে তথায় আমন্ত্রণ করিলেন। এই উৎসবোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী বসুদেব-দুহিতা সুভদ্রার অপূর্ব্ব রূপজ্যোতি অর্জ্জুনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে সখাকে কহিলেন,—হে সখা! বনচর হইয়াও শেষে নারীর নয়ন-বাণে চঞ্চল হইলে!

অর্জ্জুন তাঁহার মনোভাব স্পষ্ট করিয়াই কহিলেন,—কি উপায়ে আমাদের বিবাহ হইতে পারে, তুমিই তাহা স্থির করিয়া দাও।

অতঃপর যে উপায়টি তিনি সখাকে বলিয়া দিলেন, তাহার ফলেই উৎসবপরিদর্শনপ্রত্যাবৃত্তা সুভদ্রাকে সহসা গ্রহণপূর্ব্বক রথে তুলিয়া অর্জ্জুনের রৈবতক অতিক্রম এবং এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র দুর্দ্ধর্ষ যদুবীরগণের সুভদ্রা উদ্ধারে বিপুল রণসজ্জা ও তুমুল আস্ফালন।

কিন্তু রণযাত্রার পূর্ব্বে বিচক্ষণ বলরাম সহসা কহিলেন—তোমরা বৃথা আস্ফালন করিতেছ! দেখিতেছ না—শ্রীকৃষ্ণের মুখে কোন কথা নাই! সর্ব্বাগ্রে ইহার অভিমত আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

বলরামের কথায় সকলেই স্তব্ধ হইয়া কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলরাম তখন কৃষ্ণকে কহিলেন—যে নরাধমকে আমরা সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছি, তাহার এই কদর্য্য ব্যবহার কি আমরা সহ্য করিব? আমাদিগকে অপমানিত জানিয়াও তুমি কেন মৌন রহিয়াছ?

বলরামের কথায় অন্যান্য যাদবগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে শান্ত করিয়া কহিলেন, অর্জ্জুন আমাদের কুলের অবমাননা করেন নাই, তাঁহার এই হরণ-প্রথা অবলম্বন আমাদের কুলোচিতই হইয়াছে! আমার বিবেচনায় অবিলম্বে শিষ্টাচার প্রদর্শনে অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিয়া এখানেই বিবাহোৎসব

সম্পন্ন করা উচিত। তাহাতে অপযশের কোন আশঙ্কা থাকিবে না, বরং কুলের মর্য্যাদাই বৃদ্ধি পাইবে।

কৃষ্ণের এই উপদেশ অব্যর্থ হইল এবং অনতিবিলম্বে অর্জ্জুন ও সুভদ্রা দ্বারকায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে মহাসমারোহে তাঁহাদের পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের পর অর্জ্জুন সম্বৎসরকাল দ্বারকায় অতিবাহিত করিলেন। ইহাতে যাদবগণের সহিত তাঁহার প্রীতিবন্ধন দৃঢ়তর হইল এবং কৃষ্ণের রাজনৈতিক অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবার পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিল।

বনবাসের নিরূপিত, দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইঁহাদের নিরাপদে উপস্থিতি সংবাদ দ্বারকায় পৌঁছিলে তথা হইতে বলরাম, কৃষ্ণ, সাত্যকি ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি যাদবগণ বিপুল যৌতুকাদিসহ খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন। কিছুদিন অবস্থিতির পর কৃষ্ণ ভিন্ন অপর সকলে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। এই সময় কৃষ্ণার্জ্জুনের সমবেত চেষ্টায় খাণ্ডবদাহন এবং দগ্ধ বনভূমি ব্যাপিয়া শরণাগত দানব শিল্পী ময় কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের বিস্ময়কর বিশাল প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা। পরে এই অপূর্ব্ব ও বহু বিস্তীর্ণ প্রাসাদেই মহর্ষিগণের উপদেশে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞের আয়োজন এবং শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ ও সহায়তায় তাহার সম্পাদন ব্যবস্থা।

শ্রীকৃষ্ণ যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা, তাহার নিদর্শন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ; ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজ-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব কৌশলেই যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

রাজসূয়যজ্ঞার্থী যুধিষ্ঠির যখন শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহার অভিমত প্রার্থনা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন গম্ভীরভাবে নির্দ্দেশ দিলেন যে, এই মহাযজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে ভারতের বিচ্ছিন্ন

রাজমণ্ডলকে বাধ্য ও আয়ত্তাধীন করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ পদবী লাভ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে দারুণ অন্তরায় রহিয়াছেন মহাবল জরাসন্ধ। তিনিই এই রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভের আশায় পারিপার্শ্বিক এক শত প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিয়াশী জন নৃপতি বন্দিরূপে জরাসন্ধের কারাগারে আবদ্ধ আছেন। অবশিষ্ট চৌদ্দজন নৃপতিকেও বন্দী করিয়া আনিবার আয়োজন চলিয়াছে। রাজবন্দীদের সংখ্যা একশত পূর্ণ হইলেই তাঁহাদিগকে বলি প্রদান করা হইবে। এক্ষণে জরাসন্ধকে জয় করিয়া যিনি ঐ নৃপতীমণ্ডলকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই একচ্ছত্র সম্রাট্ পদ লাভ করিবেন।

এই সম্পর্কে জরাসন্ধের অপরাজেয় শক্তিসত্তার ও তাঁহার সহায় সম্পদের বিবরণ অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির যখন হতাশ হইয়া জানাইলেন যে, জরাসন্ধের ন্যায় পরাক্রমশালী নৃপতি বিদ্যমান থাকিতে তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার, তখন শ্রীকৃষ্ণ উৎসাহ সহকারে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—অসাধ্য নহে। কৌশলে জরাসন্ধকে বধ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভের এ সুযোগ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

যথারীতি যুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক জরাসন্ধকে পরাস্ত করা সে সময় পাণ্ডবগণের অসাধ্য এবং সেপথে অগ্রসর হইলে বহু লোকক্ষয়ের সম্ভাবনাও প্রবল। সুতরাং এ সম্পর্কে এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া তিনি সংক্ষেপে যুধিষ্ঠিরকে তাহার এইরূপ আভাস দিলেন—

অদ্বারেণ রিপোর্গেহং দ্বারেণ সুহৃদো গৃহান্।
প্রবিশন্তি নরা ধীরা দ্বারাণ্যেতানি ধর্ম্মতঃ॥

অর্থাৎ—বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা অদ্বার দিয়া শত্রুগৃহে এবং দ্বারপথে বন্ধুর

গৃহে প্রবেশ করেন। এই নীতিবাক্য অনুসারে জরাসন্ধকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার সুবিধা না দিয়া সুকৌশলে সহসা আক্রমণ-পূর্ব্বক সংহার করিবার সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনের সহিত স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে অনায়াসে দুর্ভেদ্য মগধরাজধানীতে প্রবেশ লাভে সমর্থ হন এবং জরাসন্ধ বধে তাঁহার কৌশল অব্যর্থ হয়। বিশ্বত্রাসকারী অত্যাচারী রাজা জরাসন্ধের উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ধন ও শক্তিসমৃদ্ধ রাজ্যটি পাণ্ডবগণের আয়ত্তাধীন হইল, ছিয়াশী জন নৃপতি কারামুক্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার ও পক্ষাবলম্বন করিলেন, একদিনেই যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্যপতি হইলেন। একটি মাত্র মানুষের রক্তপাতেই এই অভাবনীয় অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল। অথচ যাঁহার অপূর্ব্ব পরিকল্পনায় ইহা সম্ভব হইল, তিনি স্বয়ং তাহার খ্যাতি প্রশস্তির কোন অংশই গ্রহণ করিলেন না; ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে শুধু জানাইলেন—হে রাজেন্দ্র! ভাগ্যক্রমে ভীমসেন জরাসন্ধকে সংহার করিয়া অক্ষতদেহেই ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়াছেন। রাজগণও বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন।

ইহার পরই শ্রীকৃষ্ণনির্দ্দেশে ভীমার্জ্জুন ও নকুল সহদেবের দিগ্বিজয় উপলক্ষে অভিযান। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ও বাহুবলে জরাসন্ধের বান্ধবস্থানীয় বহু অত্যাচারী শক্তিশালী নৃপতির উচ্ছেদ করিয়া পাণ্ডবগণের বিজয়লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়ের পূর্ব্বেই আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য প্রভাবে নরকাসুর, কালযবন, শঙ্খাসুর প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ বিজাতীয় রাজগণ নিহত এবং তাহাদের সামরিকশক্তি বিধ্বস্ত হইয়াছে।

রাজসূয়যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদ-প্রক্ষালন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। পরে যজ্ঞসভায় সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রধান

রূপে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়া ভীষ্মদেব সর্ব্বপ্রথম অর্ঘ্যদানে সংকৃত করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। ইহাতে শিশুপাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবাদ করিলেন ও অন্যান্য রাজগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন শিশুপালের স্পর্দ্ধা যখন চরম হইয়া উঠিল এবং তাঁহার পক্ষাবলম্বী রাজন্যবর্গ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে উঠিয়া মৃদুগম্ভীরস্বরে সভাস্থ রাজগণকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—হে রাজন্যবর্গ! এই মন্দমতি বহুবার আমার সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছে। কিন্তু আমি ইহার মাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম যে, ইহার বধোচিত শত দুষ্কর্ম্ম মার্জ্জনা করিব। সেই নিমিত্তই এ পর্য্যন্ত আমি ইহাকে উপেক্ষা করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ইহার শতাধিক অপরাধ পূর্ণ হইয়াছে, অতএব আর নিষ্কৃতি নাই।—সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শিশুপালকে আক্রমণপূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে শিশুপালের এই প্রাণদণ্ড দেখিয়া তাহার দলভুক্ত বিদ্রোহোন্মুখ নৃপতিগণ সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কেহই আর কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। কিন্তু শিশুপালের দণ্ডবিধানের পরই শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে যুধিষ্ঠির তাঁহার পুত্রকে সেই সভাস্থলেই চেদি রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রস্থান করেন। ইহার পর যখন অক্ষক্রীড়া সম্পর্কে ভয়াবহ ব্যাপার সংঘটিত হয়, তখন তিনি দ্বারকায়। ক্রীড়ায় পরাজিত পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সহিত যে সময় সরস্বতীতীরবর্ত্তী কুরুজাঙ্গলান্তর্গত কাম্যকবনে আবাস স্থাপন পূর্ব্বক কায়ক্লেশে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই দুঃসংবাদ অবগত হইয়া তথায় সাক্ষাৎ করিতে উপনীত হন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ কৌরবগণের এই অনাচার সম্পর্কে মর্ম্মপীড়িতা দ্রৌপদীকে প্রবোধদানে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহা কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সেই বাণী

এইরূপ,—পৃথিবী অবশ্যই দুর্য্যোধনাদির রক্তপান করিবে। আমি ক্ষমতা অনুসারে পাণ্ডবদের সহায়তা করিতে ত্রুটি করিব না। আকাশ পতিত, হিমাচল বিদীর্ণ এবং সমুদ্র শুষ্ক হইতে পারে, কিন্তু আমার এ কথা মিথ্যা হইবে না।

অনন্তর পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে প্রবোধ দিয়া তিনি দ্বারকায় প্রস্থান করেন।

পাণ্ডবগণের বনবাসের যখন আর অল্পকাল মাত্র অবশিষ্ট এবং গন্ধমাদন, দ্বৈতবন প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা যখন পুনরায় কাম্যকবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী সত্যভামাকে সঙ্গে লইয়া এই বনে উপনীত হইলেন। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন—তুমি যে রাজ্যলাভ অপেক্ষা ধর্ম্মকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছ, ইহা তোমারই উপযুক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনও এতকাল ধরিয়া দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রয়োগকৌশল শিক্ষা করিয়াছে। তোমার প্রতিজ্ঞা-কাল পূর্ণ হইলেই আমরা কুরুকুল নির্ম্মূল করিয়া তোমাকে সাম্রাজ্য প্রদান করিব।

দ্রৌপদীকে তিনি আশ্বাস দিলেন—তোমার পুত্রগণের জন্য চিন্তা করিও না। সুভদ্রা তোমার স্নেহাভিষিক্ত হইয়া তাহাদিগকে পালন করিয়াছেন। অভিমন্যু তাহাদের সকল বিষয়ের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছেন।

অজ্ঞাতবাসের পর বিরাটনগরে পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশের সংবাদ পাইয়াই শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর পুত্রগণ সুভদ্রা, অভিমন্যু এবং বলরাম, সাত্যকি প্রমুখ বীরগণের সহিত মৎস্যরাজ্যে উপনীত হন। শ্রীকৃষ্ণেরই সুচিন্তিত পরামর্শে তথায় বিরাট রাজকন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া পাণ্ডবগণের গুণমুগ্ধ ও পক্ষপাতী রাজন্যবর্গকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিবাহান্তে পাণ্ডবগণের রাজ্যপ্রাপ্তি-

সম্পর্কে যে পরামর্শসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণকেই আমরা প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। সভায় সমবেত বিরাট ও দ্রুপদরাজ হইতে প্রত্যেকেই কর্ত্তব্য অবধারণার্থে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের হিতাহিত আলোচনা সম্পর্কে সুস্পষ্টস্বরে কহিলেন - হে নৃপতিগণ! রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় শকুনি কর্তৃক যেরূপ শঠতাদ্বারা পরাজিত, হৃতসর্ব্বস্ব ও বনবাসের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন। যদিও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ইঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে বলপূর্ব্বক পরাজিত করেন নাই, শঠতাপূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তথাপি ইঁহারা কৌরবগণের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন না। ইঁহারা কেবলমাত্র স্ববাহুবলে বিজিত সাম্রাজ্যের প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করেন। এক্ষণে আপনারা পূর্ব্বাবধি পাণ্ডবগণের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অন্যায়াচার ও রাজ্যলোলুপতা, পাণ্ডবগণের ধর্ম্মশীলতা এবং পরস্পরের সম্বন্ধ ও অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করুন।

অতঃপর সভায় নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হইল। বলরাম রূঢ়বাক্যে দুর্য্যোধনকে কুপিত না করিয়া সবিনয়ে শান্ত-বাক্য দ্বারা সন্ধি প্রার্থনার প্রস্তাব তুলিলেন। সাত্যকি প্রভৃতি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। দ্রুপদ কহিলেন—আমার বিবেচনায় সর্ব্বপ্রথম রাজন্যবর্গের নিকট দূত প্রেরণপূর্ব্বক বলবৃদ্ধি ও সৈন্যসংগ্রহ করা প্রয়োজন। যে পক্ষের দূত অগ্রে উপস্থিত হইবে, সেই পক্ষেরই কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

কৃষ্ণ দেখিলেন, দুর্য্যোধনের অনুকূলে বলরামের উক্তি সভায় বাক-বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়াছে। বলরাম দ্যূতজনিত অনাচারের জন্য দুর্য্যোধনকে দায়ী না করিয়া, দ্যূতকুশলী না হইয়াও দ্যূতবিশারদ শকুনির সহিত ক্রীড়ারত হইবার জন্য যুধিষ্ঠিরকেই দোষী করিতে চান। এ

অবস্থায় জ্যেষ্ঠের সম্মান রক্ষার্থ প্রসঙ্গটি চাপা দিবার জন্য তিনি সহসা কহিলেন—যতক্ষণ সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছে, ততক্ষণ আমাদের ন্যায় উভয় পক্ষের আত্মীয়গণের ইহাতে লিপ্ত থাকা উচিত হয় না। আমরা বিবাহ উপলক্ষে আহূত হইয়াছিলাম, সে কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে; অতএব আমরা এখন স্ব স্ব গৃহে গমন করি। যদি সন্ধি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য মিত্রগণের সহায়তার আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবেন।

কিন্তু সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বেই উভয়পক্ষ সাংগ্রামিক আয়োজন আরম্ভ করিয়া বল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সূত্রে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন দুইজনেই এক সঙ্গে দ্বারকায় প্রবেশপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের আবাস-ভবনে উপনীত হইলেন।

এখানেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কূট-কৌশল দ্বারা দুর্য্যোধনকে অভিভূত করিয়া দিলেন। তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত রণ-দুর্ম্মদ এক অর্ব্বুদ নারায়ণীসেনা দুর্য্যোধনকে অর্পণ করিলেন এবং তিনি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না, এই সঙ্কল্প প্রকাশপূর্বক দুর্য্যোধনকে আশ্বস্ত করিয়া স্বয়ং অর্জ্জুনের পক্ষান্তরে পাণ্ডবগণের পক্ষ গ্রহণ করিলেন।

কৌরবগণের সহিত সন্ধি স্থাপনের আলোচনার মধ্যেও কৃষ্ণের সুকল্পিত কৌশলের পরিচয় পরিস্ফুট। কাম্যকবনে দ্রৌপদীর মুখে দ্যূত-সভায় তাঁহার অপরিসীম লাঞ্ছনার কাহিনী শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তীক্ষ্ণকণ্ঠে যে সংহার-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কৌরব-সভায় সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া যাত্রার পূর্ব্বেও রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর সমক্ষে তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে, কুরু-পাণ্ডবে সন্ধি হইবে না; তথাপি তিনি সন্ধির জন্য কৌরব সভায় প্রস্তাব লইয়া চলিলেন। যাহা কর্ত্তব্য তাহা

করিতে হইবে, তাহাতে ফল হউক বা না হউক ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মূলমন্ত্র ও গূঢ় শিক্ষা।

এই সন্ধি সম্পর্কে কৌরব-সভায় শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যে কূটরাজনীতিজ্ঞের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবেই দেখিতে পাই। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধনের অনাচারগুলি উল্লেখ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না, অথচ, স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, হিতৈষীদের বাক্য উপেক্ষা করিলে কিছুতেই তোমার কল্যাণ হইবে না!—ন শর্ম্ম প্রাপ্স্যসে রাজন্নুৎক্রম্য সুহৃদাং বচঃ। সুতরাং একদিক দিয়া হিতবচনে তিনি দুর্য্যোধনের শ্রেয়ঃ সাধনপক্ষে আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন বুঝায়, অন্যদিকে তাঁহার শ্লেষবাক্যই যেন দুর্য্যোধনকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলে এইরূপ উপলব্ধি হয়। শ্রীকৃষ্ণ এ ক্ষেত্রে কূটরাজনীতিকের মত দ্বিভাবার্থজ্ঞাপক বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

অতঃপর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও দুর্য্যোধনাদির নিধন সম্পর্কে কৌরবপক্ষকে অধর্ম্ম তথা অসত্যের পরিপোষক জানিয়া এবং তাঁহাদের উচ্ছেদে ধর্ম্ম ও সত্যের প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিয়া তিনি কূটরাজনীতি-চক্র চালনা করিয়াছেন এবং প্রয়োজনস্থলে কপটাচরণেও কুণ্ঠিত হন নাই।

কুরুক্ষেত্রে প্রথম দিনের যুদ্ধ প্রারম্ভে আত্মীয় স্বজনের নিধন আশঙ্কায় শোকে মুহ্যমান হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিগূঢ় সংসার তত্ত্ব বুঝাইয়া উৎসাহিত করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা হইতেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অবতারণা।

সাংখ্য পাতঞ্জল, ন্যায়, মীমাংসা, বৈশেষিক ও বেদান্তাদি দর্শন-সমুদ্র মন্থনে সারতত্ত্ব নিষ্কাসন করিয়া পরম দার্শনিকরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ

দান করেন, তাহা এই গীতায় সুপ্রকাশ। জরামরণশীল মানবের পক্ষে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম তিনেরই যে প্রয়োজন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাহারই আভাস দিয়াছেন। এই সময় কর্মকাণ্ড দোষদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, ভক্তিমার্গে কণ্টক দেখা দিয়াছে, জ্ঞানপথ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সত্য পথের সন্ধান দিলেন, সংসারসন্তপ্ত জনগণকে অভয় দিয়া বলিলেন—ভয় নাই, যে যেমন অবস্থায় আছ, বিচলিত হইও না, উদ্ধার পাইবে। গৃহী হও, সন্ন্যাসী হও, কর্ম্মী হও, ভক্ত হও, জ্ঞানী হও, যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই মুক্তি লাভের পথ আছে; সে পথ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এই দার্শনিক মত পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, তিনি সকল সম্প্রদায়ের সকল প্রকার সুখ শান্তি বিধানের জন্যই গীতায় এই অপূর্ব্ব নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

নিরুৎসাহ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥

অর্থাৎ—আত্মা বা জীবের বিনাশ নাই। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। অতএব তুমি সুখদুঃখ, লাভালাভ ও জয় পরাজয়কে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহাতে তোমার পাপ হইবে না।

এখানে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করার শান্তিস্থাপনের প্রয়াসই প্রকারান্তরে সুপরিস্ফুট হইতেছে। রাজ্যে যুধিষ্ঠিরের ন্যায্য অধিকার। দুর্য্যোধন অন্যায়পূর্ব্বক তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছুক। এই উপলক্ষে

যুদ্ধ এবং এইজন্তই অশান্তি। সেই অশান্তি দূর হইতে পারে কি প্রকারে? যিনি রাজা, রাজ্যে যাঁহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার, তিনি যদি আপনার রাজ্যের উপর অধিকার প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই সকল অশান্তির অবসান হইতে পারে। এ অবস্থায় অর্জ্জুন যুদ্ধে বিরত হইলে, অশান্তি দূর হয় না, বরং অত্যাচারীই প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অত্যাচারীর দণ্ডবিধান ব্যতীত শান্তি সংস্থাপনের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অর্জ্জুন রাজার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য। কাজেই সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্ররোচনাকারী হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ;—যাঁহার প্ররোচনার কৌশলে রাষ্ট্র ও রাজার এবং ধর্ম্মের ও সমাজের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন সংঘটিত হইয়াছিল।

— —

শান্তনু

মহাভারতীয় কথায় মহারাজ শান্তনুর প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচ্য। রাজা শান্তনুর সম্বন্ধে মহাভারতকার লিখিয়াছেন—

স রাজা শান্তনুর্ধীমান্ দেবরাজর্ষিসংকৃতঃ।
ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বলোকেষু সত্যবাদীতি বিশ্রুতঃ॥

রাজা শান্তনু দেবগণ, রাজগণ ও ঋষিগণের আদৃত এবং বুদ্ধিমান্, ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী বলিয়া সমস্ত জগতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

স হস্তিনাপুরে রম্যে কুরূণাং পুটভেদনে।
বসন্ সাগরপর্য্যন্তামন্বশাসদ্বসুন্ধরাম্॥

তিনি কুরুবংশীয়দিগের রাজধানী মনোহর নদীতীরবর্ত্তী হস্তিনাপুরে থাকিয়া, সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী শাসন করিতেন।

লোকবিশ্রুত পুণ্যপ্রতাপ রাজর্ষিকল্প রাজেন্দ্রগণ যে সকল লোকদুর্ল্লভ গুণরাশির অধিকারী ছিলেন, কৌরব-কুলতিলক মহারাজ শান্তনুর গুণ-কীর্ত্তনে মহাভারতকার সে সমস্তই একটি একটি করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি ধীর, বীর, দাতা, উদার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, সমদর্শী, দীনবন্ধু এবং আদর্শ প্রজাবৎসল নৃপতি।

এই সকল বিশিষ্ট গুণের উপর আর একটি মহান্ গুণের পরিচয়ও আমরা এই মহামনীষীর চরিত্রে দেখিতে পাই, তাহা প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং তাহাই মহারাজ শান্তনুর দাম্পত্য-জীবনকে যেন জটিল ও রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

পুরাণবর্ণিত বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবন-চিত্র যে এই প্রতিশ্রুতির প্রভাবে

চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রাজ্ঞী কৈকেয়ীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া মহারাজ দশরথকে যে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং যে প্রতিশ্রুতিকে উপলক্ষ করিয়া রামাভিষেকের শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছিল, রামায়ণকার বাল্মীকি তাহা অনবদ্য তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন।

মহারাজ শান্তনুর মহান্ চরিত্রও এই প্রতিশ্রুতির আবর্ত্তে ওতপ্রোত-ভাবে পরিপ্লুত। এমন কি, তাঁহার সত্যনিষ্ঠ দেবকল্প পুত্র সত্যব্রত ভীষ্মের জীবনের গতিও এই প্রতিশ্রুতির প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

পূর্ব্বপুরুষগণের মত শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল ছিলেন। তিনি প্রায়ই মৃগয়াসক্ত হইয়া নানা বন ও উপবন পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। একদা মৃগয়ার পর একাকী ভাগীরথীতীরবর্ত্তী উপবন অতিক্রম করিবার সময় তিনি এক সর্ব্বসুলক্ষণা সালঙ্কারা অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং অগ্রবর্ত্তী হইয়া সেই অপরিচিতার পাণি-প্রার্থনা করিলেন।

অপরিচিতা কহিলেন—আমার পাণি-গ্রহণের পূর্ব্বে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, আমার কোন কার্য্য আপনার অপ্রীতিকর হইলেও আপনি আমাকে তাহা হইতে নিবারণ করিতে বা তজ্জন্য কোনরূপ কটূক্তি করিতে পারিবেন না। করিলেই সেই দণ্ডে আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিব।

কন্যার কথায় সম্মত হইয়া রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন—তাহাই হইবে। কন্যাও পরমানন্দে রাজকরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহার ভার্য্যাত্ব স্বীকার করিলেন।

কালক্রমে রাজার ঔরসে উক্ত কন্যার গর্ভে আটটি সন্তান জন্মগ্রহণ

করিল। কিন্তু যখনই পুত্র জন্মিত, তখনই জননী 'আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিতেছি' বলিয়া স্রোতে ডুবাইয়া দিতেন। ভার্য্যার এই নিষ্ঠুরাচরণ রাজার অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও, পাছে তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান—এই আশঙ্কায় নীরবই থাকিতেন। স্বামীর মর্ম্মবেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া রাজমহিষী কিন্তু সেই সময় এই বলিযা রাজাকে আশ্বাস দিতেন—আপনি অবিচলিত থাকুন, যথা-সময়ে আপনাকে আমি প্রসন্ন কবিব। অষ্টম পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইলে মহিষী আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাব হাসি রাজার ধৈর্য্যবন্ধন এবারে শিথিল করিযা দিল। তিনি বুঝিলেন, রাজ্ঞীর এই হাসির পশ্চাতে সন্তানহত্যার নিষ্ঠুব স্পৃহা প্রচ্ছন্ন বহিযাছে। 'আমি সন্তুষ্ট করিতেছি' বলিযা এখনি তাহাকে স্রোতের মুখে নিক্ষেপ কবিবেন। পত্নীর এই নৃশংসাচরণে বাধা দিতে রাজা যেমন এই প্রথম বদ্ধপবিকব হইলেন, অমনি পত্নীর সম্বন্ধে একটা দারুণ সন্দেহও এই সময় তাঁহার অন্তবকে বিক্ষুব্ধ করিযা তুলিল। তাই তিনি দৃঢ়স্বরে পত্নীকে কহিলেন—

মা বধীঃ কাসি কস্যাসি কিঞ্চ হংসি সুতানিতি।
পুত্রঘ্নি! সুমহৎ পাপং সম্প্রাপ্তং তে বিগর্হিতম্॥

পুত্রহত্যায নিষেধ করিয়া রাজা পত্নীর সত্য পরিচয জানিতে চাহিলেন। কেন তিনি পুত্রগুলিকে জন্মিবামাত্র বধ করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইহাতে যে তিনি অত্যন্ত গর্হিত ও গুরুতর পাপাচরণ করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

পত্নী তখন জানাইলেন—

পুত্রকাম! ন তে হন্মি পুত্রং পুত্রবতাং বর।
জীর্ণোঽস্তু মম বাসোঽয়ং যথা স সময়ঃ কৃতঃ॥

স্বামীর নিষেধবাক্য শুনিয়াই পত্নী অবিচলিতকণ্ঠে কহিলেন যে, তিনি এ পুত্রটিকে বধ করিবেন না, তবে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজার সঙ্গে থাকার সমাপ্তিও এইখানে হইল। তাহার পর পরিচয় সম্বন্ধে রাজার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এই প্রথম রাজাকে জানাইলেন—

অহং গঙ্গা জহ্নুসুতা মহর্ষিগণসেবিতা।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমুষিতাহং ত্বয়া সহ॥

আত্মপরিচয় দিয়া গঙ্গাদেবী এই সময় সন্তানহত্যার কারণ সম্পর্কে এক অলৌকিক উপাখ্যানও স্বামীকে শুনাইলেন। তিনি কহিলেন—শুধু দেবকার্য্য সাধনার্থই আমি তোমার ভার্য্যা হইয়াছিলাম। মহাতেজা বসুগণ ব্রহ্মশাপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মর্ত্তলোকে তুমি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষই ইঁহাদের জনক হইতে পারে না, আবার আমার ন্যায় গর্ভ-ধারিণী কোন মনুষ্য-রমণীই ইহলোকে নাই; এই নিমিত্তই আমি মানুষী হইয়া ইঁহাদিগকে গর্ভে ধরিবার এবং ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সদ্য সদ্য মুক্তি দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। অভিশপ্ত সেই অষ্ট বসুর মধ্যে সাতজন শাপমুক্ত হইয়াছেন, অবশিষ্ট অষ্টম বসু—আমার গর্ভজাত এই পুত্রটিকে আপনি গ্রহণ ও পালন করুন। আপনি এই পুত্রটিকে গঙ্গার গর্ভজাত ও গঙ্গাদত্ত বলিয়া জানিবেন।

গঙ্গাদেবীর এই উক্তির শেষ বাণীটি এইরূপ—

—স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি পুত্রং পাহি মহাব্রতম্।

অর্থাৎ—আপনার মঙ্গল হোক, আমি এখন যাইতেছি। আপনি এই ভাবী মহাসংযমী পুত্রটিকে পালন করুন।

শান্তনু এ পর্য্যন্ত পত্নীর প্রকৃত পরিচয় পান নাই। যদিও ভাগীরথী-তীরে প্রথম দর্শনকালে ইঁহাকে দর্শন করিয়া রাজা অনেকগুলি প্রশ্নই করিয়াছিলেন—'তুমি কে? দেবী, গন্ধর্ব্বী, অপ্সরা, না মানবী?' কিন্তু

প্রশ্নগুলির উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই অধীরভাবে ইহাও বলিয়াছিলেন —'তা তুমি যেই হও না কেন, আমি তোমাকে সহধর্ম্মিণীর মর্য্যাদায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি আমার ভার্য্যা হও।' সুতরাং গঙ্গার পক্ষ হইতে তখন তাঁহার রূপমুগ্ধ রাজার এতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজনই হয় নাই, তিনি শুধু নিজের প্রয়োজনের দিকে চাহিয়া নিজ নির্ব্বন্ধ ও প্রতিশ্রুতির কথাটাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ প্রচ্ছন্ন সত্যের পরিচয় পাইয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন।

গঙ্গাগর্ভজাত এই পুত্রের নাম দেবব্রত। বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের মধুর ব্যবহারে পিতাকে, পুরবাসীদিগকে এবং রাজ্যের সমস্ত লোককে অনুরক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। রাজাও ক্রমশঃ পুত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই ভাবে আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল।

এই সময় মহারাজ শান্তনুর 'কামরাগবিবর্জ্জিত চিত্ত' কুসুমায়ুধের অব্যর্থ-সন্ধানে আর একবার বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাহার অপ্রীতিকর পরিণাম ভারতবংশের গতি ধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত করিয়া দিল।

একদা তিনি যমুনাতীরবর্ত্তী অরণ্য-ভ্রমণ-কালে অভূতপূর্ব্ব এক দিব্য গন্ধ অনুভব করিয়া চমৎকৃত হইলেন। সেই গন্ধের অনুসরণ করিয়া তিনি দেবকন্যার ন্যায় এক পরমসুন্দরী তরুণীকে যমুনা-বক্ষে তরণী চালনা করিতে দেখিলেন। দর্শন মাত্রই রাজার চিত্ত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তরুণীকে প্রশ্ন করিলে তিনি কহিলেন,—আমি কৈবর্ত্ত-জাতীয় জনৈক রাজার কন্যা, পিতার আজ্ঞায় ধর্ম্মার্থ এই নদীতে নৌকা চালাইতেছি।

রাজার আর ধৈর্য্য সহিতেছিল না। তৎক্ষণাৎ তরুণীর পিতৃসমীপে গমন করিয়া তাহার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। রাজা বোধ হয় ভাবিতেছিলেন,

তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়াই কৈবর্ত্তরাজ কৃতকৃতার্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কন্যাদান করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু তিনি এমন কৌশলে রাজার অভ্যর্থনা করিলেন এবং আটঘাট বাঁধিয়া রাজার কথাটার উত্তর দিলেন যে, শান্তনুর ন্যায় প্রজাপালক সত্যনিষ্ঠ রাজার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার সামর্থ্য রহিল না। কৈবর্ত্তরাজ দৃঢ়তার সহিত রাজাকে জানাইলেন, কন্যা যখন জন্মিয়াছে, তখন তাহাকে বরের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে বৈ কি। কিন্তু আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, ইহার গর্ভে আপনার যে পুত্র জন্মিবে, আপনার পরে সে-ই রাজা হইবে।

দেবব্রতের ন্যায় সর্ব্বগুণবান্ পুত্র বিদ্যমানে রাজা কখনও এরূপ অঙ্গীকার করিতে পারেন না ; সুতরাং তিনি মনের দুঃসহ বেদনা মনেই চাপিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর আমরা দেখিতে পাই, বন-ভ্রমণ-প্রত্যাগত পিতাকে অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া দেবব্রত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পিতার হিতৈষী জনৈক বৃদ্ধ মন্ত্রীর শরণাপন্ন হইয়া পিতার মনোবিকারের কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পিতার অগোচরে পিতৃবয়স্ক প্রবীণদিগকে লইয়া কৈবর্ত্তরাজের ভবনে উপনীত হইলেন। অতঃপর রাজ্যত্যাগ ও চিরব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দানে পরিতুষ্ট করিয়া কৈবর্ত্তপতিকে হস্তিনাপতির হস্তে কন্যা-সম্প্রদানে স্বীকৃত করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা শান্তনু সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রের এই কঠোর ত্যাগের প্রশংসা করিলেন ও তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিলেন। এই বিবাহের পর সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে মহাভারতে প্রসিদ্ধ।

শান্তনুর চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা ইহাই উপলব্ধি করিতে

পারি যে, তিনি সে যুগের নিয়মতন্ত্রী রাজা ছিলেন এবং রাজ্যের শাসন-ব্যাপারে নিয়মতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। শৃঙ্খলারক্ষার সম্বন্ধেও তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। গঙ্গার পাণিগ্রহণের পূর্ব্বে যে নিযমে তিনি সম্মতি দিযাছিলেন, উপর্য্যুপরি নবজাত সাতটি সন্তানের প্রতি প্রসূতির চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়াও তিনি সে নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই। কিন্তু অষ্টম পুত্রটিব জন্মকালে তিনি আর নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা কবিতে পাবেন নাই। বাজধর্ম্মানুস্থত শৃঙ্খলারক্ষার অভাবও এই সম্পর্কে সূচিত হইতেছে বুঝিযা তখন তাঁহাকে কঠোর হইতে হইয়াছিল। ইহাতে নযনানন্দদাযিনী জীবন-সঙ্গিনীব সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও তিনি দৃঢতার সহিত রাজ্ঞীকে পুত্র-হত্যায নিবাবণ কবেন ও তাঁহার অনুষ্ঠিত নৃশংসাচবণ সম্পর্কে কাবণ জানিতে চাহেন। তিনি যে স্বৈবাচাবী নৃপতি ছিলেন না, কৈবর্ত্ত-রাজেব নিকট তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা ও প্রত্যাখ্যান হইতেও তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায়। ইচ্ছা কবিলে তিনি অনায়াসেই বাঞ্ছিতা সত্যবতীকে বাহুবলে গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সত্যবতীর পিতার আপত্তি সমীচীন মনে করিয়াই তিনি ভগ্নমনে রাজধানীতে ফিরিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা শান্তনুর উদ্দেশে মহাভারতকারের পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্ম্মিক ও পরম ধীমান বিশেষণগুলি যে সুসঙ্গত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মনঃক্ষুন্ন পিতার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে দেবব্রতের কঠোব প্রতিজ্ঞা ও চরম স্বার্থত্যাগ সম্পর্কে রাজা শান্তনুর চরিত্রে নিষ্ঠুরতা বা স্বার্থপরতার আরোপও যুক্তিসিদ্ধ নহে। দেবব্রত পিতার অগোচরেই কৈবর্ত্ত-রাজের আলয়ে গিয়াছিলেন এবং কঠোর প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহার সম্মতি লইয়া যখন পিতৃসকাশে ফিরিলেন, শান্তনুর পক্ষে তখন চমৎকৃত

হওয়া ব্যতীত পুত্রকে নিরস্ত করিবার আর উপায় ছিল না, নিয়মতন্ত্রী পিতা জানিতেন, তাঁহার সত্যনিষ্ঠ সত্যব্রত পুত্র হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, তথাপি সত্যভ্রষ্ট হইবেন না। এ অবস্থায় মহান্ কুরুবংশ ও বিশাল রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সত্যবতীকে অস্বীকার করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

ভীষ্ম

মহাভারতের ভীষ্ম প্রসঙ্গে প্রথম কথাটি এই যে,—

"দ্যুনামা শান্তনোঃ পুত্রঃ শান্তনোরধিকো গুণৈঃ।"

শান্তনুর পুত্র ভীষ্ম শান্তনু অপেক্ষা অধিক গুণবান্ হইয়াছিলেন। রাজা শান্তনুর এই গুণবান্ পুত্রটির সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, হস্তিনার রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যসমন্বিত রাজপুরী ও রাজ্যাধিপতি পিতার সংশ্রব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জননী গঙ্গাদেবীর তত্ত্বাবধানে অজ্ঞাতভাবেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইঁহার জননী ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাতটি সন্তানকে জন্মমাত্রেই স্রোতে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছি।" কিন্তু এই অষ্টম সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহার মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়াছিল। রাজা শান্তনু রাজ্ঞীর মুখের এই হাসিটুকুই তাঁহার সন্তানহত্যা-স্পৃহার করাল ছায়া ভাবিয়া পূর্ব্বকৃত নিয়ম ভঙ্গ করিয়া বাধা দিয়াছিলেন। ইহার পর রাজ্ঞী রাজাকে পরিত্যাগ করিলেও, এই সন্তানটিকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি এই নবজাত পুত্রকে লইয়া রাজধানীর লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যান এবং সিদ্ধ জনসেবিত ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী সিদ্ধারণ্যে অবস্থিতি করিতে থাকেন। মাতার প্রযত্নে বালক ষোড়শ বৎসর বয়সেই কুরুবংশের রাজকুমারোচিত যাবতীয় শিক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়া উঠেন। এবং একদা শরজালে গঙ্গাবক্ষ অবরুদ্ধ করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী মৃগয়ার্থী পিতাকে চমৎকৃত করিয়া দেন। গঙ্গাও

এই সময় আবির্ভূতা হইয়া পুত্রের পরিচয় দিয়া তাহাকে রাজার হাতে সমর্পণ করিয়া অদৃশ্য হন। রাজাও কৃতবিদ্য পুত্রকে লইয়া রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং সচিববর্গ ও আত্মীয়স্বজনকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

এই সময় পিতাকে অতিশয় বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া এবং বৃদ্ধ মন্ত্রীর নিকট তাহার কারণ অবগত হইয়া তিনি বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত ধীবর-রাজভবনে গিয়া পিতার জন্য তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। ধীবর ইঁহাদিগের যথোচিত সৎকার করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে জানাইলেন,—সত্যবতীকে যদিও আমি প্রতিপালন করিয়াছি, কিন্তু ইঁহার জন্মদাতা মহাকুলসম্ভূত নৃপতি উপরিচর। অনেকেই সত্যবতীর প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু আমি সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। আপনার পিতা এই কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিলে, আমি তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, আপনাকেও তাহাই বলিতেছি—

"বলবৎসাপত্ন্যতামত্র দোষং পশ্যামি কেবলম্।"

আপনিই প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন, ইহাই এই বিবাহের একমাত্র দোষ দেখিতেছি।

বুদ্ধিমান সত্যব্রত ভীষ্ম কূটবুদ্ধি ধীবররাজের কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বসমক্ষে তৎক্ষণাৎ কহিলেন—আপনি যাহা বলিলেন, আমার পক্ষ হইতে তাহার উত্তর এই যে,—

"যোঽস্যাং জনিষ্যতে পুত্রঃ স নো রাজা ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ—সত্যবতীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই আমাদের রাজা হইবে।

কিন্তু দেবব্রতের এই প্রতিশ্রুতিও যথেষ্ট নয় ভাবিয়া ধীবর রাজ আপত্তি

তুলিলেন,—আপনার এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনারও ত পুত্র হইবে? তাহার সম্বন্ধেই আমাদিগের গভীর সন্দেহ রহিয়াছে।

ধীবর-রাজের এই উক্তির পর দেবব্রত তাঁহার চরম প্রতিশ্রুতি দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন,—

রাজ্যং তাবৎ পূর্ব্বমেব ময়া ত্যক্তং নরাধিপাঃ।
অপত্যহেতোরপি চ করিষ্যেঽদ্য বিনিশ্চয়ম্ ॥
অদ্য প্রভৃতি মে দাস! ব্রহ্মচর্য্যং ভবিষ্যতি।
অপুত্রস্যাপি মে লোকা ভবিষ্যন্ত্যক্ষয়া দিবি ॥

অর্থাৎ—পূর্ব্বে আমি রাজ্য-সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার অনপত্যতা সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিতেছি অদ্য হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালনই আমার ব্রত হইবে।

দেবব্রতের এই প্রতিশ্রুতির পর ধীবর-রাজ শান্তনুকে কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। আর এই কঠোর প্রতিজ্ঞার জন্য এই দিন হইতে তিনি ভীষ্ম নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন।

পিতাকে পরিতুষ্ট করিতে এত বড় ত্যাগ—সমগ্র জীবনের অনাস্বাদিত সুখ-সম্ভোগ বিসর্জ্জন দিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের এরূপ আদর্শ চিত্র অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় বলিয়াই ভারত-শাস্ত্রকারগণ এই অকৃতদার অপুত্রক মহামনীষীর উদ্দেশে তর্পণের নির্দ্দেশ দিয়া তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। রাজা যযাতির পুত্র পুরু যদিও শুক্রাভিশাপে জরাগ্রস্ত পিতার ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন, তথাপি ভীষ্মের এই ত্যাগ তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী কঠোর। ইহাতে পিতার আদেশ বা নির্দ্দেশ নাই, স্বেচ্ছায় তিনি পিতার জন্য আত্মোৎসর্গ

করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া যযাতিপুত্র পুরুর জরাগ্রস্ত অবস্থার সময়ের একটা সীমা ছিল, কিছুকাল জরাগ্রস্ত থাকিয়া তিনি পুনরায় পূর্ব্বকান্তি ও স্বাস্থ্যপূর্ণ যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মের এই আত্মত্যাগ চির-জীবনের জন্য। সমগ্র শৈশবকাল পিতার সংস্রবশূন্য অবস্থায় অতি-বাহিত করিয়াও ঐহিক জীবনের যাহা কিছু কাম্য পিতৃতুষ্টির জন্য অম্লানবদনে বর্জ্জন করিবার এরূপ মর্ম্মভেদী চিত্র পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। ভীষ্মের ত্যাগের মূলে পিতার আজ্ঞা নাই, তাঁহার অজ্ঞাতেই তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব লোকের সহিত সর্ব্বদেবময় পিতাকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদ্বয়—চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্যকে রাখিয়া রাজা শান্তনু পরলোক গমন করিলেন। ভীষ্ম হইলেন ইঁহাদের অভিভাবক। কিন্তু তিনি যে সকল বিষয়েই মাতা সত্যবতীর পরামর্শ লইতেন, মহাভারতে তাহার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মাতার আদেশানুসারে তিনি চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু এই তরুণ নৃপতি অতিশয় উদ্ধত-প্রকৃতি ও হঠকারী ছিলেন, বলদর্পে তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেন না এবং কাহারও প্রশংসা সহ্য করিতে পারিতেন না; সর্ব্বদাই দেবগণ, অসুরগণ ও মনুষ্যগণের নিন্দা করিতেন। এই সূত্রে চিত্রাঙ্গদ নামক কোন গন্ধর্ব্বরাজের সহিত তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং সেই যুদ্ধের ফলে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটে। ভীষ্ম অনুজ বিচিত্রবীর্য্যের দ্বারা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করাইয়া তাঁহাকেই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কিন্তু ভীষ্মের ন্যায় মহারথ এই শোচনীয় ভ্রাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইবার কোনরূপ প্রয়াস পান নাই বলিয়া, কেহ কেহ ভীষ্মের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুযোগ এই যে, ভীষ্ম এই যুদ্ধের

সময় কোথায় ছিলেন? ভ্রাতৃঘাতী গন্ধর্ব্বপতিকে তিনি যুদ্ধে আহ্বান করেন নাই কেন? কিন্তু মহাভারতে কুরুরাজ চিত্রাঙ্গদের স্বল্পরাজত্বকালের যে পরিচয়টুকু পাওয়া যায়, তাহাতে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, তিনি অমিতবিক্রমে রাজমণ্ডলকে পরাজিত করিয়া অতিশয় স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠেন। সেইজন্য দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মানব সকলেরই তিনি অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই অতিস্পর্দ্ধাই তাঁহার পতনের কারণ হইয়াছিল। এই সূত্রে সুরাসুরবিজয়ী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সহিত তাঁহার দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হয়। কুরুরাজ চিত্রাঙ্গদ বোধ হয় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদ তরুণ প্রতিযোদ্ধার এই দুর্ব্বলতাটুকুর সুযোগ লইয়াই তাঁহাকে নিহত করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ যে স্থলে ধর্ম্মযুদ্ধের অন্তর্গত, সেখানে নিহত ভ্রাতার নিধনকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার বা যুদ্ধ ঘোষণা করিবার কি সার্থকতা থাকিতে পারে? বিশেষতঃ যে যুদ্ধ রাষ্ট্রগত নহে, ব্যক্তিগত। স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রগত কারণ পরম্পরায় এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভীষ্ম যদি বুঝিতেন যে, তাঁহার ভ্রাতা অন্যায়ভাবে নিহত হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি কখনই ভ্রাতৃঘাতী চিত্রাঙ্গদকে উপেক্ষা করিতেন না। মহাভারতেও উল্লেখ আছে, কুরুরাজকে বধ করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ সুরলোকে অন্তর্দ্ধান করেন। এমনও হইতে পারে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে উভয় যোদ্ধাই নিহত হইয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রাঙ্গদের সুরলোকে অন্তর্দ্ধান কথাটিও রহস্যাবৃত। মহাভারতেও এই ব্যাপারটি অতি সংক্ষেপেই বিবৃত হইয়াছে। যদি ইহাই ধরা যায়, চিত্রাঙ্গদকে বধ করিয়াই তিনি ক্ষিপ্রগতিতে স্বর্গ-সন্নিহিত দুর্গম গন্ধর্ব্বলোকে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও ভীষ্মের মত স্থিরমস্তিষ্ক মনীষীর পক্ষে

ভ্রাতৃঘাতী গন্ধর্ব্বের অনুসরণ অপেক্ষা নিহত ভ্রাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া, মাতাকে সান্ত্বনা দান এবং সঙ্গে সঙ্গে হস্তিনার শূন্য রাজসিংহাসনে রাজভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের অভিষেক ব্যবস্থাই সমীচীন ও যুক্তি-যুক্ত। সুতরাং চিত্রাঙ্গদের বধ ব্যাপারে কোন প্রকারেই ভীষ্মের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করা যাইতে পারে না, বরং দূরদর্শিতার দিক দিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যধারার সমর্থন করাই সঙ্গত।

ইহার পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, নবীন রাজা বিচিত্রবীর্য্যের উপযুক্ত মহিষীসংগ্রহের জন্য তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। এই সময় বারাণসীপতি একই দিনে তাঁহার অপ্সরাতুল্য সুন্দরী তিনটি কন্যার স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃশোকাতুর ভীষ্ম তরুণ-বয়স্ক ভ্রাতাকে স্বয়ংবর সভায় না পাঠাইয়া নিজেই ভ্রাতার প্রতিভূ হইয়া স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলেন। ইহাতে স্বভাবতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, গন্ধর্ব্বহস্তে কুরুরাজ চিত্রাঙ্গদের নিধনে কুরুবংশের বলাপকর্ষ সম্বন্ধে কাণাঘুষা উঠিয়াছিল, রাজন্য-সমাজেও একটা সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছিল। এই সংশয়টুকুর নিরাকরণ এবং হস্তিনার কুরুরাজবংশের সার্ব্বভৌম শক্তির উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য ভীষ্ম স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বারাণসীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মের উপস্থিতি রাজন্যবর্গের প্রীতিপদ হয় নাই। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কথাই তাঁহারা শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শৌর্য্যের কোন পরিচয়ই এ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই; সুতরাং অকুণ্ঠিত চিত্তেই তাঁহারা ভীষ্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা বলিলেন যে, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ এই বৃদ্ধটি স্বয়ংবরসভায় আসিয়াছেন কেন? চির-ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রতিজ্ঞা করিয়া যে লোকপ্রসিদ্ধ হইয়াছে, এখন তাহাকে স্বয়ংবর সভায় দেখিয়া লোকে কি বলিবে?

যাহা হউক, রাজগণ যখন ভীষ্মের সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা করিতে-ছিলেন, এবং ঘোষকগণ সমবেত রাজন্যবর্গের নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ভীষ্ম তখন তাঁহাদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া জলদ গম্ভীরস্বরে রাজা বিচিত্রবীর্য্যের জন্য কন্যাত্রয়কে প্রার্থনা করিলেন। ভীষ্মের এই স্পর্দ্ধায় সভাস্থ সকলেই স্তব্ধ; ভীষ্ম কিন্তু কাহাকেও বাঙ্‌নিষ্পত্তির অবসরটুকু না দিয়াই অষ্টবিধ বিবাহের সংজ্ঞার সহিত নির্দেশ দিলেন যে, বিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া স্বয়ংবরা কন্যাকে হরণপূর্ব্বক যে বিবাহ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাহাই প্রশস্ত এবং প্রশংসনীয়। অতএব আমি বলপূর্ব্বক এই কন্যা কয়টিকে হরণ করিতেছি। আপনাদিগের সাধ্য থাকে ত ইহাদিগকে উদ্ধার করুন।

পরক্ষণেই স্বয়ংবর সভা সমরক্ষেত্রে পরিণত হইল। কিন্তু রাজগণ সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়াও কন্যাত্রয়কে ভীষ্মের রথ হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন না। এমন কি, পথিমধ্যে মহাবল শাল্বরাজও ভীষ্মকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। ভীষ্ম তখন বিজয়গৌরবে স্বয়ংবরা কন্যাত্রয়কে পুত্রবধূ এবং কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় প্রবেশ করিলেন। ভারতের রাজন্যবর্গ এই সর্ব্বপ্রথম কুরুবীর ভীষ্মের অপ্রতিহত সামরিক শক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন।

ভীষ্মের সঙ্কল্প তিন কন্যাকেই বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা জানাইলেন যে, তিনি শাল্বরাজের প্রতি অনুরক্তা, পূর্ব্বে তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। নীতিবিদ্‌দিগের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনার পর ভীষ্ম অগত্যা তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

রাজকন্যা অম্বা কিন্তু শাল্বরাজ সমীপে উপনীত হইয়া উপেক্ষিতা

হইলেন। ভীষ্ম কর্তৃক বিজিতা অম্বাকে তিনি গ্রহণ করিলেন না, আশ্রয়ও দিলেন না। প্রত্যাখ্যাতা রাজকন্যার অন্তর্নিহিত রোষবহ্নি তখন ভীষ্মের উদ্দেশে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভীষ্মকে দণ্ড দিবার জন্য ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ বীর পরশুরামের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু পরশুরামের সাহায্যেও ভীষ্মকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া ভীষ্মের নিধন কামনায় দেহত্যাগ করিলেন। এই উপেক্ষিতা নারীর ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মঘাতী অবসান ভীষ্মের চিত্তের উপর অনুশোচনার কি গভীর রেখাপাত করিয়াছিল, তাঁহার আত্মত্যাগেই তাহা সুপ্রকাশ।

অতঃপর অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। এই বিবাহের সাত বৎসর পরে বিচিত্রবীর্য্য যক্ষ্মা রোগে অকালে দেহত্যাগ করিলেন। অপুত্রক বিচিত্রবীর্য্যের অভাবে ভারতবংশ লুপ্ত হইবার আশঙ্কা সূচিত হইল।

এই সঙ্কটসময়ে সত্যবতী ভীষ্মকে কহিলেন—আমার আদেশে তুমি ভারতবংশ রক্ষা কর। তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হও, ধর্ম্মানুসারে দারপরিগ্রহ কর; পিতৃপুরুষদিগকে নরকে নিমগ্ন করিও না।

কিন্তু ভীষ্ম অটল। তিনি দৃঢ়তার সহিত কহিলেন—মা! আপনি ত আমার প্রতিজ্ঞার কথা জানেন! কোন প্রকারেই আমি সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ভীষ্মের এই বাণী তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার পরিশিষ্টরূপে মহাভারতের অঙ্গে দেদীপ্যমান রহিয়াছে—

পরিত্যজেয়ং ত্রৈলোক্যং রাজ্যং দেবেষু বা পুনঃ।
যদ্বাপ্যধিকমেতাভ্যাং ন তু সত্যং কথঞ্চন॥

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর সত্যবতীর আদেশে ভীষ্মকেই সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সাম্রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। কালক্রমে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র,

পাণ্ডু ও বিদুরের উৎপত্তি হইলে ভীষ্মের তত্ত্বাবধানেই তাঁহারা লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া পাণ্ডুকে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হইতে তিন ভ্রাতার বিবাহ প্রভৃতি সমস্তই ভীষ্মের ব্যবস্থানুসারেই নির্ব্বাহ হইয়াছিল। পাণ্ডুর রাজত্বকালেও ভীষ্মই সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি রাজসিংহাসনে না বসিলেও বিশাল কুরুরাজ্য যে তাঁহারই নির্দ্দেশে পরিচালিত হইতেছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এমন কি, রাজ্যপরিচালনার দায়িত্ব ভীষ্মের ন্যায় মহাপ্রাজ্ঞের উপর ন্যস্ত ছিল বলিয়াই মহারাজ পাণ্ডু নিশ্চিন্তমনে হস্ত অশ্ব-রথ ও পদাতি-সঙ্কুল বিপুল রণবল লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইতে পারিয়াছিলেন এবং ইহার পর বন-বিহার বাসনায় প্রিয়তমাদের সহিত হিমালয়ের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য প্রদেশে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

তবে ভীষ্ম উপদেষ্টা থাকিলেও এ সময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র। বনগমনের পূর্ব্বে মহারাজ পাণ্ডু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে হস্তিনার সিংহাসনে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বিদুর এই সময় বিনীতভাবে কিঙ্করের ন্যায় চামর বীজন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের সেবা করিতেন। সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গ মহারাজ পাণ্ডুর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে প্রভু বলিয়া মানিতেন। ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যা ব্যতীত বিদুরকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। যথা—কোষবর্দ্ধন, ভৃত্যবর্গের পর্য্যবেক্ষণ, দান ও সকলের ভরণপোষণের ব্যবস্থা। আর ভীষ্মদেব সন্ধি, বিগ্রহ ও দানাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পরও ভীষ্মকেই কুরুরাজ্যের কর্ণধাররূপে আমরা দেখিতে পাই। কুরুবালকগণের অভিভাবকরূপে ভীষ্মদেবই তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তৎপর। কৃপাচার্য্যের নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভের

পর কুমারগণকে কোন অসাধারণ ধনুর্ব্বেদাধ্যাপকের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য তিনি যখন একান্ত আগ্রহশীল, সেই সময় অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ মহাভাগ দ্রোণাচার্য্যের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে এই দুই মহামনীষীর কথোপকথন কি মর্ম্মস্পর্শী! দ্বারে দ্বারে প্রত্যাখ্যাত, নিদারুণ অভাবের পেষণে নিষ্পেষিত দ্রোণ যখন আর্ত্তস্বরে তাঁহার চরম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার কথা ব্যক্ত করিলেন, গুণজ্ঞ ভীষ্ম তখন গম্ভীরস্বরে আচার্য্যকে কহিলেন—

অপজ্যং ক্রিয়তাং চাপং সাধ্বস্ত্রং প্রতিপাদয়।
ভুঙ্ক্ষ ভোগান্ ভৃশং প্রীতঃ পূজ্যমানঃ কুরুক্ষয়ে॥

মহাশয়, আপনি ধনুর গুণ নামাইয়া ফেলুন, কুরুবালকদিগকে সুচারুরূপে অস্ত্রশিক্ষা দিন এবং কুরুগৃহে সম্মানিত ও বিশেষ সন্তুষ্ট থাকিয়া সমস্ত ভোজ্য বস্তু ভোগ করিতে থাকুন।

শুধু মুখের কথা নহে, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ধনধান্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন একখানি ভবন দ্রোণাচার্য্যকে দান করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত আমরা ভীষ্মকেই কুমারগণের অভিভাবক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের সর্ব্বে-সর্ব্বা নিয়ামকরূপেই দেখিতে পাই। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই রাজ্য ও রাজপুরী সংক্রান্ত সকল কার্য্যই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতেছিল। সন্ধি-বিগ্রহ ও দানাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের যে দায়িত্বগুলি ভীষ্মের উপর অর্পিত ছিল, এগুলি ইহাদের অন্তর্গত সন্দেহ নাই।

চিত্রাঙ্গদ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত যতগুলি নৃপতির শাসনকাল অতিবাহিত হইয়াছে, কাহারও সহিত ভীষ্মের কোনরূপ সংঘর্ষ বা মতদ্বৈধ ঘটে নাই; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধনের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহার সম্ভাবনা নানাসূত্রেই প্রকাশ পাইল। কুমারগণের অস্ত্রপরীক্ষার দিন দুর্য্যোধন যখন সদম্ভে কর্ণকে সর্ব্বসমক্ষে অঙ্গরাজ্যের

সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন অথচ এ সম্বন্ধে ভীষ্মের ন্যায় পূজ্য অভিভাবকের সম্মতিও গ্রহণ করিলেন না, এমন কি নবাগত অজ্ঞাত-কুলশীল কর্ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধের ভয় পর্য্যন্ত দেখাইলেন, তখনই মনে হয় যে, এই ঘটনার পূর্ব্ব হইতেই বিচক্ষণ ভীষ্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আত্মাভিমানী ও প্রভুত্বপ্রয়াসী দুর্য্যোধনকে লইয়া শীঘ্রই অনর্থ উপস্থিত হইবে। দুর্য্যোধনকে তুষ্ট করিবার জন্যই সম্ভবতঃ স্নেহপ্রবণ ধৃতরাষ্ট্র অঙ্গরাজ্যের আধিপাত্য তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন যখন কর্ণকে এই রাজ্য দান করেন এবং অজ্ঞাতকুলশীল কর্ণের পক্ষ সমর্থন করিয়া পাণ্ডবদিগকে খর্ব্ব করিতে প্রয়াস পান, ভীষ্মকে তখন কোন প্রতিবাদ করিতেও দেখা যায় নাই। এসম্বন্ধে মহাভারতের কথা এই যে—

পাণ্ডবাশ্চ সহদ্রোণাঃ সকৃপাশ্চ বিশাম্পতে।
ভীষ্মেণ সহিতাঃ সর্ব্বে যযুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্।

পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। সুতরাং দুর্য্যোধনের এই কার্য্য ভীষ্মের অভিপ্রেত হয় নাই।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে মহাভারতে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে যে, ধৃতরাষ্ট্রই যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এখানেও ভীষ্মের কোন প্রসঙ্গই নাই। সুতরাং ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, ধৃতরাষ্ট্রের নির্দ্দেশ অনুসারেই এই সময় রাজ্য পরিচালিত হইতেছিল এবং তিনিই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভীষ্মদেব পূর্ব্ববৎ সন্ধি বিগ্রহ ও দানাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

আমরা দেখিতে পাই যে, হস্তিনার রাজসভায় তাঁহার সমক্ষে যখনই যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাহার বৈধতার অনুকূলে বরাবরই নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়া ন্যায়নিষ্ঠার

পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যাত হইলে রাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত মহাভারতে কুত্রাপি নাই। পাণ্ডবদিগের সহিত সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুসভায় দূতরূপে উপনীত হন, এবং দুর্য্যোধন দম্ভভরে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, তখনও ভীষ্ম ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই, তিনি পুনঃ পুনঃ দুর্য্যোধনকে অনুরোধ করিয়াছেন—দুর্য্যোধন! তুমি বাসুদেবের হিতবাক্যের অনুবর্ত্তী হও। কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইয়া প্রজাগণকে বিনষ্ট করিও না। তুমি স্নেহসহকারে পাণ্ডবদিগের সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ কর। সকল রাজধানীতে তুমি কুশল সংবাদ ঘোষণা কর এবং বিগত সন্তাপ বিস্মৃত হইয়া সৌভ্রাত্র সহকারে এই পৃথিবী ভোগ কর।

দুর্য্যোধনের উপেক্ষায় ভীষ্মকে ক্রুদ্ধ বা বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই; কিন্তু যে সময় দুর্য্যোধন দূতরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার চক্রান্তে প্রবৃত্ত হন, তখন কৌরব রাজসভায় বয়োবৃদ্ধ তেজস্বী সন্ধি-বিগ্রহ-সচিবরূপী ভীষ্মদেব এই সর্ব্বপ্রথম দৃঢ়তার সহিত ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার এই সন্তান অতিশয় দুর্ব্বুদ্ধি। তুমিও বান্ধবগণের বাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক এই কুপথগামী পাপাত্মার অনুবর্ত্তন করিতেছ। আমি এই সকল অন্যায়কথা শ্রবণ করিতে বাসনা করি না। অতঃপর তিনি ক্রোধভরে সভা হইতে প্রস্থান করেন।

পক্ষান্তরে পরম স্নেহাস্পদ মহামানী দুর্য্যোধনকে দুর্ম্মনায়মান দর্শন করিয়া তিনিই প্রথমে আশ্বাস দিয়াছিলেন—তুমি দুঃখিত হইও না দুর্য্যোধন! তোমার পক্ষাবলম্বন করিয়া আমি সেই শুশ্রূষাসম্পন্ন, অনসূয়, ব্রহ্মপরায়ণ, সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব। দ্যূত-যুদ্ধে হৃতরাজ্য যুধিষ্ঠিরের পক্ষ সমর্থন না করিয়া রাজ্যাধিকারী দুর্য্যোধনের

আনুগত্যস্বীকার ভীষ্মের ন্যায় রাজভক্ত সচিবের নিয়ম-নিষ্ঠারই পরিচায়ক।

সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বেও ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলেন, পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে আমি তোমাদের পক্ষ হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি সত্য; কিন্তু পাণ্ডবেরাও আমার প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাহাদিগকে সৎপরামর্শপ্রদানও আমার কর্ত্তব্য। কুরুসৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভীষ্ম এ কর্ত্তব্যও পালন করিয়াছিলেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে সদুপদেশ এমন কি নিজের বধোপায় পর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছিলেন।

পিতার নিকট ভীষ্ম স্বেচ্ছামৃত্যু বর পাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিবসে তাঁহার মৃত্যুর উপলক্ষ হইলেন দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডী। এই শিখণ্ডী সম্বন্ধে ভীষ্মের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অম্বা নামে লোকবিশ্রুতা উপেক্ষিতা কাশীরাজদুহিতাই নবীন যৌবনে দেহত্যাগ করিয়া শিখণ্ডিরূপে দ্রুপদকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভীষ্ম এ সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন—বিশ্বস্ত চরগণ আমাকে এই বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অম্বার ন্যায় রূপযৌবনসমন্বিতা রাজকন্যার শোচনীয় মৃত্যুর জন্য ভীষ্ম নিজেকেই নিমিত্ত স্থির করিয়াছিলেন। তারপর যখন বিশ্বস্তসূত্রে জ্ঞাত হইলেন যে, উপেক্ষিতা অম্বাই জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া দ্রুপদকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই অতীতের অনুশোচনা তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলে এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেন,—'আমি এই শিখণ্ডীকে যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত দেখিয়াও মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত নিরীক্ষণ বা আক্রমণ করিব না।' এই প্রতিজ্ঞার সমর্থনে তিনি ইহাও ব্যক্ত

করিলেন যে,—'স্ত্রী, স্ত্রীপূর্ব্ব-পুরুষ, স্ত্রীনামধারী ও স্ত্রী-স্বরূপ পুরুষকে কদাচ আমি প্রহার করিব না।' মহাভারতে এই শিখণ্ডীর যে চমকপ্রদ কাহিনী বিবৃত আছে, তাহাতে প্রকাশ যে, তিনি প্রথমে স্ত্রীভাবাপন্নাই ছিলেন, পরে কোন সিদ্ধ যক্ষের প্রসাদে পুরুষভাবাপন্ন হন। কিন্তু শিখণ্ডী সম্বন্ধে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার বিষয় আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, অম্বার অপমৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তের জন্যই তিনি এই শিখণ্ডীকে উপলক্ষ করিয়া স্বেচ্ছা-মৃত্যুর পথটি উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন।

ফলতঃ দেবব্রত ভীষ্মের দীর্ঘ জীবনটাই যেন একটা বিরাট প্রতিজ্ঞার আভায় সমুজ্জ্বল। এই প্রতিজ্ঞার প্রভাব আর্য্য জাতির মহিমা চির-গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে—সিদ্ধপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মের অমর অবদানে তাহা অনুরঞ্জিত হইয়া আছে!

দ্রোণাচার্য্য

ভরদ্বাজ মুনির ঔরসে ঘৃতাচী নামক অপ্সরার গর্ভে মহাভারতের অন্যতম প্রধান পুরুষ দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যতে দ্রোণাচার্য্য নামে বিখ্যাত হন। ইনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেন, বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ হন। কিন্তু শাস্ত্র অপেক্ষা শস্ত্রবিদ্যায় তিনি অধিকতর অনুরাগী হওয়ায় তাহাতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

দ্রোণ প্রসিদ্ধ কৃপাচার্য্যের ভগিনী কৃপীকে বিবাহ করেন। শিক্ষাসমাপ্তির পর দ্রোণ যখন কৃপীকে লইয়া সংসারী হইলেন, তখন তাঁহার অভাবের অন্ত নাই। পত্নী কৃপী ও পুত্র অশ্বত্থামার ভরণপোষণে তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন। ক্ষাত্র বিদ্যা শিক্ষা করায় প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ-সমাজে তিনি অপাংক্তেয় হইয়া রহিলেন, তাঁহাদের কোন সাহায্যই পাইলেন না। অথচ ক্ষাত্র বিদ্যাও তাঁহার পক্ষে অর্থকরী হইল না। অর্থাভাবে দ্রোণ যেন চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, পরশুরাম বিরাট দানযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার দানে বহু দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যের অবসান হইয়াছে। আশায় উৎফুল্ল হইয়া দ্রোণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের অবস্থার কথা বলিলেন। কিন্তু পরশুরাম দ্রোণকে কহিলেন—"আমার যাহা কিছু ধন রত্ন ছিল, সমস্তই ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে রিক্তহস্ত হইয়াছি। এখন অবশিষ্ট আছে—এই দেহ এবং কতকগুলি মহামূল্য অস্ত্র শস্ত্র। আপনাকে কি দিব বলুন?' বুদ্ধিমান দ্রোণ প্রয়োগ ও

নিবারণের সঙ্কেত-কৌশল সহ সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রই গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

নব নব শস্ত্রের সন্ধান পাইয়া শস্ত্রবিদের মনে আনন্দ ধরে না, কিন্তু তাহাতে ত সাংসারিক অভাব মোচনের কোন উপায় হইল না কৃপী অতিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে অভাবের কথা জানাইলেন। শস্ত্র-সাধনা ফেলিয়া দ্রোণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় কি? কিরূপে এই নিদারুণ সাংসারিক অভাবের নিবৃত্তি হইবে? উপায় অন্বেষণ করিতে সহসা তাঁহার মনে দূর অতীতের এক সতীর্থের প্রতিশ্রুতি স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল।

পাঞ্চালরাজ পৃষত-পুত্র দ্রুপদ ছিলেন দ্রোণের সহপাঠী। তিনি দ্রোণের পিতা মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার নিকট শস্ত্র ও শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। এই সূত্রে দ্রোণের সহিত রাজপুত্র দ্রুপদের বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় হইয়া উঠে যে, দ্রুপদ কথায় কথায় প্রায়ই প্রিয় বন্ধু দ্রোণকে বলিতেন, আমি রাজা হইলে অর্দ্ধেক পাঞ্চাল রাজ্য তোমাকে দিব। ইহার অন্যথা হইবে না। এই দারুণ দুঃসময়ে বন্ধুর কথা মনে পড়িতেই দ্রোণ পাঞ্চালে চলিলেন দ্রুপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। রাজা পৃষত তখন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, দ্রুপদ হইয়াছেন রাজা। বিপুল আশা লইয়া মলিন বসনধারী দরিদ্র দ্রোণ রাজসভায় প্রবেশ করিলেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সখা বলিয়া সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজার দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু তাহার ফলে রাজা দ্রুপদ তীক্ষ্ণকণ্ঠে দ্রোণের উদ্দেশে যে কটুবাণী প্রয়োগ করিলেন, দ্রোণের সকল আশাই তাহাতে মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া গেল। দ্রুপদ বলিলেন,—শিক্ষার অভাবে তোমার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই, তাই দেশের বা সমাজের রীতি তুমি জান না। অ-ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের এবং অ-রাজা রাজার সখা হয় না।

ঐশ্বর্য্যের এই স্পর্দ্ধায় মর্ম্মাহত হইয়া এবং একটা উদ্দাম প্রতিশোধ স্পৃহাকে মনের ভিতর পোষণ করিয়া দ্রোণ নিজ ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার শোচনীয় দারিদ্র্যের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না। দুগ্ধলোলুপ বালক অশ্বত্থামার মুখে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিটুলী-গোলা জল দিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন; সামান্য একটু দুগ্ধ সংগ্রহের সামর্থ্যও তাঁহার নাই—এমনই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা চলিয়াছে!

ইহার পরই আমরা দেখিতে পাই যে, দ্রোণ হস্তিনায় আসিয়া কৃপাচার্য্যের ভবনে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই অবস্থাতেই কুরু বালকগণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় দৃশ্যটি বড়ই চমকপ্রদ। ইহাতে দ্রোণের বুদ্ধিমত্তার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি কুরুবালকগণ সেদিন নগর সন্নিহিত প্রান্তরে একটি গুটিকা লইয়া ক্রীড়ানন্দে ছুটাছুটি করিতেছিল। সহসা সেই গুটিকাটি একটি জলশূন্য গভীর কূপমধ্যে পড়িয়া গেল। বালকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা তুলিতে পারিল না এবং তুলিবার কোন উপায় না পাইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। এই সময় তাহাদের দৃষ্টি সহসা প্রান্তরের শেষাংশে বৃক্ষতলবর্ত্তী এক অদ্ভুত অগ্নিহোত্রীর দিকে আকৃষ্ট হইল। তাহারা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখিল—শ্যামবর্ণ, শুক্লকেশ, কৃশদেহ এক ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রের অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া হোম করিতেছেন।

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে অপ্রত্যাশিতভাবে এই অদ্ভুত অগ্নিহোত্রীকে দেখিয়া বালকগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কূটবুদ্ধি দ্রোণ যে গূঢ় উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়েই বালকদিগের খেলার মাঠে এইভাবে বসিয়াছিলেন এবং তাহাদের আশাভঙ্গের কারণটি জানিতে পারিয়াছিলেন,

বালকদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রথম বাণী হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়,—

অহো বো ধিগ্বলং ক্ষাত্রং ধিগেতাং বঃ কৃতাস্ত্রতাম্।
ভরতস্যান্বয়ে জাতা যে বীটাং নাধিগচ্ছত।

অর্থাৎ দ্রোণ বালকদিগকে ধিক্কার দিয়া কহিলেন,—ওহে তোমাদের ক্ষাত্রবীর্য্যেও ধিক্, আর তোমাদের শস্ত্রশিক্ষাতেও ধিক্! তোমরা ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও ঐ গুটিকা তুলিতে পারিলে না!

বালকগণ লজ্জিত ও চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে কহিল,—ইহা যে অসম্ভব! আপনি ঐ গুটিকাকে জলশূন্য গভীর কূপ হইতে তুলিতে পারেন?

দ্রোণ হাসিয়া উত্তর দিলেন,—গুটিকা ত অনেক বড়, আমার অঙ্গুলীর এই ক্ষুদ্র আংটিটিও আমি ঐ কূপমধ্যে ফেলিয়া দিয়া অনায়াসে ঐ গুটিকার সহিত এক সঙ্গে তুলিতে পারি। কিন্তু তোমরা বল, যদি আমি সক্ষম হই, তোমরা আমাকে এক বেলার খাদ্য দিবে?

যুধিষ্ঠির এই সময় অগ্রবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—মহাশয়! এক বেলার কেন, কৃপাচার্য্যের অনুমতি হইলে আপনি দুই বেলারই উত্তম আহার্য পাইবেন।

দ্রোণ তৎক্ষণাৎ নিজের অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া কূপে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে একগাছি নল-খাগড়া দেখাইয়া কহিলেন,—দেখ, আমি ইহাকেই অভিমন্ত্রিত করিতেছি। তোমরা ইহার ক্ষমতা দেখ—যাহা অন্যের নাই। ইহার সাহায্যেই আমি তোমাদের গুটিকা ও আমার আংটি এখনই উপরে তুলিয়া আনিতেছি।

দ্রোণ মুখে যাহা বলিলেন, কার্য্যেও তাহাই সম্পন্ন করিলেন; বালকগণ বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। সকলেই তখন

শ্রদ্ধাবনত শিরে দ্রোণের চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন,—ব্রাহ্মণ! আমরা আপনাকে অভিবাদন করিতেছি। এক্ষণে বলুন, আমরা আপনার কি করিব?

দ্রোণ কহিলেন,—তোমরা ভীষ্মের নিকট আমার কথা বলিতে পার।

এই সূত্রেই দ্রোণ ভীষ্মের সহিত পরিচিত হইলেন। বহুদর্শী ভীষ্মও দ্রোণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন। এই সময় তিনি অকপটে এই বিচক্ষণ কুরুবৃদ্ধের নিকট তাঁহার শোচনীয় দারিদ্র্যের সহিত প্রতিশ্রুত দ্রুপদের স্পর্দ্ধাজনক উপেক্ষার কাহিনী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করিয়া অভিমানের সুরে কহিলেন,—

অপি চাহং পুরা বিপ্রৈর্বর্জিতো গর্হিতো ভৃশম্।
পরোপসেবাং পাপিষ্ঠাং ন চ কুর্যাং ধনেপ্সয়া ॥

অর্থাৎ,—আমি ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা শিখিয়াছিলাম বলিয়া প্রতিবেশী ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে আমাকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং এখন আর আমি ধনলাভের আশায় পাপজনক পরসেবা করিব না।

কিন্তু কুরুরাজ্যের সন্ধি বিগ্রহ ও দানাদি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব বয়োবৃদ্ধ ভীষ্মদেব এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন দরিদ্রের দারিদ্র্যমোচনের ব্যবস্থাদির দ্বারা যে ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, তাহাতে দ্রোণের অভিমানবিক্ষুব্ধ-চিত্তের সমস্ত গ্লানি নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। এতদিন পরে তাঁহার দারিদ্র্যের অবসান ঘটিল। কিন্তু বুদ্ধিকে পরিচালিত করিয়া এভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিলেও তিনি আত্মীয়শ্রেষ্ঠ কৃপাচার্য্যের কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার প্রসঙ্গ তুলিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, আমার প্রতিষ্ঠায় কৃপাচার্য্যের ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি যেমন অভাবমোচনকল্পে কিঞ্চিৎ ধনপ্রার্থী

হইয়া আসিয়াছিলাম, তেমনই আনন্দিত চিত্তেই নিজের আশ্রমে চলিয়া যাই।

দ্রোণের এই আপত্তির অর্থটুকু অনুভব করিয়া ভীষ্ম তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন,—কৃপাচার্য্যের জন্য কেন আপনি চিন্তিত হইতেছেন? তিনিও তাঁহার মর্য্যাদার সহিত এখানে থাকিবেন এবং আমরা যেমন তাঁহার ভরণ পোষণ করিতেছি, তেমনি করিতে থাকিব। আপনি কুরুবালকগণের প্রধান আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হইলেন; কেননা, আমার মতে আপনিই উপযুক্ত আচার্য্য। দ্রোণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। অতঃপর তিনি কুরুবালকগণের অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য হইলেন।

দ্রোণাচার্য্যের চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি স্বভাবতঃই কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মনে যে সঙ্কল্পের উদয় হইত, বুদ্ধির সহায়তায় তাহা সিদ্ধ করিতে তিনি অতিশয় তৎপর থাকিতেন। কিন্তু এই বুদ্ধিপ্রতিভার উপরে যে বিশুদ্ধ বোধশক্তির প্রাদুর্ভাব ভীষ্মের চরিত্রকে সুমহান্ করিয়া তুলিয়াছিল, দ্রোণাচর্য্যের চরিত্রে আমরা সেই দুর্লভ বোধশক্তির অভাব দেখিতে পাই। এই জন্যই তিনি ক্ষত্রিয়ের বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়সুলভ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের প্রভাব হইতে নিজেকে অব্যাহত রাখিতে পারেন নাই। শিক্ষাদান সম্পর্কেও আদর্শ শিক্ষকোচিত সমদর্শিতার অভাব আমরা তাঁহার আচরণে দেখিতে পাই। নিজপুত্র অশ্বত্থামাকে বিরলে নূতন নূতন অস্ত্রপ্রয়োগ সন্ধান শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তিনি জল ভরিবার জন্য অন্যান্য শিষ্যগণকে কমণ্ডলু এবং পুত্র অশ্বত্থামাকে কলসী দিতেন। ঝরণার জলে কমণ্ডলু ভরিতে বিলম্ব হইত, কিন্তু অশ্বত্থামা স্বল্প সময়েই কলসী ভরিয়া ফিরিয়া আসিতেন। এই

অবসরটুকুর মধ্যেই তিনি পুত্রকে একটি না একটি নূতন অস্ত্রপ্রয়োগের সন্ধান দিতেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহার এই কূটবুদ্ধি ধরিয়া ফেলিয়াছিল এবং ঝরণার জল আহরণে না গিযা বায়ব্য-বাণে কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া অশ্বত্থামার সহিত একই সময়ে গুরুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইতেন। গুরু তখন উভয় প্রিয় পাত্রকেই বিরলে নূতন শিক্ষা দিতেন।

অর্জ্জুনের অসাধারণ প্রতিভা দ্রোণকে তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। মেধাবী ছাত্রের প্রতি গুরুর এইরূপ বিশেষ অনুরাগ এ যুগেও আমরা দেখিতে পাই। ইহাকে দূষণীয় বলা যাইতে পারে না। অর্জ্জুনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া একদা দ্রোণ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াই ফেলিলেন, - "প্রযতিষ্যে তথা কর্তুং যথা নান্যো ধনুর্দ্ধরঃ। ত্বৎসমো ভবিতা লোকে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে" অর্থাৎ—বৎস! আমি সত্য বলিতেছি এই ধরাধামে আমার কোন শিষ্য যাহাতে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে না পারে, আমি সে ব্যবস্থা করিব। কিন্তু এমনই সাংঘাতিক ক্ষণে তিনি এই কয়টি কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন যে, কিছুকাল পরে তাহাই এক ভয়ঙ্কর অবস্থার উপলক্ষ হইয়া দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় মহামনীষীর নির্ম্মল চরিত্রে এক কঠোর নিষ্ঠুরতার কলঙ্ক নিবিড়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিল।

নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণ-সন্নিধানে আসিয়া অস্ত্র-শিক্ষার প্রার্থনা জানাইলে দ্রোণ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্যাখ্যাত নিষাদরাজপুত্র মনে মনে দ্রোণকেই আচার্য্যপদে বরণ করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করে ও তথায় দ্রোণের মৃন্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ব্রতধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে সে কঠোর সাধনাপ্রভাবে অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধান বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠে। একদা কুরুবালকগণ সেই অরণ্যে মৃগয়া করিতে যায়। তাহাদের দলভুক্ত

চীৎকারপরায়ণ একটি কুকুরের কণ্ঠধ্বনিমাত্র স্তব্ধ করিতে তাহার মুখবিবরে অক্ষতভাবে সাতটি শরসন্ধান-কৌশল রাজকুমারদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। কুকুরের অনুসরণ করিয়া তাহারা শিক্ষারত একলব্যের সম্মুখে উপস্থিত হইল ও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, সে দ্রোণেরই শিষ্য। অর্জ্জুনের মনে তৎক্ষণাৎ অভিমান দেখা দিল। গুরুর সান্নিধ্যে ছুটিয়া গিয়া তিনি কহিলেন,—আপনি বলিয়াছিলেন, আপনার কোন শিষ্যই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে না ; কিন্তু আপনার এই নিষাদ শিষ্য শরসন্ধানে যে অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা আমারও অজ্ঞাত !

দ্রোণ তখন চমৎকৃত হইয়া শিষ্যগণ সহ একলব্যের সাধনার স্থানে উপনীত হইলেন। দ্রোণকে দেখিবামাত্র নিষাদপুত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহার পাদ বন্দনা করিল এবং গুরুর যোগ্য মর্য্যাদা দিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। এই অবস্থায় দ্রোণাচার্য্য তাঁহার শিষ্য বলিয়া পরিচয়দাতা একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাহার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠটি প্রার্থনা করিলেন। নিষাদপুত্র তৎক্ষণাৎ গুরুদক্ষিণার সহিত গুরুর প্রতি শিষ্যের নিষ্ঠার এক অভূতপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়া সভ্যজগতকে স্তব্ধ করিয়া দিল।

দ্রোণের মনোবৃত্তি এইভাবে কূটবুদ্ধির প্রভাবে পরিচালিত হইত এবং অধিকাংশস্থলে তাহার উপলক্ষ হইতেন তাঁহার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুন। অর্জ্জুনকে সন্তুষ্ট বা নিষ্কণ্টক করিবার জন্যই তাঁহাকে এই নিষ্ঠুরাচরণ করিতে হইয়াছিল। শিক্ষা সম্পর্কে শিষ্যগণের মনোবৃত্তি হইতেই দ্রোণাচার্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের সংঘর্ষ অনিবার্য্য। এইজন্যই সম্ভবতঃ তিনি অর্জ্জুনকে ব্রহ্মশির নামক মহা অস্ত্রের প্রয়োগ সন্ধান শিক্ষা দিয়া তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণা চাহিয়াছিলেন 'যুদ্ধেঽহং প্রতিযোদ্ধব্যো যুধ্যমানস্ত্বয়াহনঘ।' অর্থাৎ আমিও

যুদ্ধার্থী হইলে তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিবে এই দক্ষিণা আমি চাই। সে সময় বাধ্য হইয়াই তাহাতে অর্জ্জুনকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল।

দ্রুপদ কর্ত্তৃক লাঞ্ছনার কথাও দ্রোণ বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইতেই দ্রোণাচার্য্য তাহাদিগের নিকট দক্ষিণা চাহিলেন,—"পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে, ইহাই তোমাদের গুরুদক্ষিণা।" রাজকুমারগণ সসৈন্য পাঞ্চাল রাজ্যে অভিযান করিলেন। দ্রোণ এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ না করিলেও তিনিই যে ইহার পরিচালক ছিলেন, পাঞ্চাল রাজ্যে তাঁহার উপস্থিতি ও যুদ্ধক্ষেত্রে চক্রব্যূহ রচনার পরিকল্পনা হইতেই তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। এখানেও তাঁহার মনোবৃত্তির উপর কূটবুদ্ধির ক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

রাজা দ্রুপদ বন্দী ভাবে তাঁহার নিকট নীত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য বিনীত দ্রুপদকে জানাইলেন,—তোমার রাজ্য ও জীবন এখন আমার অধীন। কিন্তু তোমার প্রাণের ভয় নাই, কেননা আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ। এ অবস্থাতেও আমি তোমাকে সখা বলিয়া মনে করিতেছি। তবে তুমিই বলিয়াছিলে—অ-রাজা রাজার সখা হইতে পারে না; তাই আমি রাজ্যগ্রহণে যত্ন করিয়াছি; আর, তোমাকেও রাজ্যচ্যুত না করিয়া বিজিত পাঞ্চালের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতেছি। আমার এই ব্যবস্থায় তুমি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে রাজা রহিলে, আর আমি উহার উত্তর তীর অধিকার করিলাম। এখন ইচ্ছা করিলে তুমিও আমাকে সখা বলিয়া ভাবিতে পার।

যিনি একদিন গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় অন্বেষণে পাঞ্চাল রাজ্যের রাজসভায় ভিখারীর মত উপস্থিত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, আজ তিনি সেই পাঞ্চালের শ্রেষ্ঠাংশের অধিপতিরূপে রাজমর্য্যাদা লাভ করিলেন। অতঃপর দ্রোণাচার্য্য ভাগীরথীর উত্তর কূল হইতে চর্ম্মণ্বতী নদী পর্য্যন্ত

ভূভাগ আপনার অধিকারে আনিয়া অহিচ্ছত্রা নগরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন।

রাজা দ্রুপদ যে অর্দ্ধ রাজ্যের অধিকার পাইলেন, ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কাম্পিল্য নগরী তাহার রাজধানীর মর্য্যাদা পাইল। কিন্তু এই ঘটনার পর রাজা দ্রুপদের সমস্ত ক্রোধ দ্রোণের উপর গিয়া পড়িল। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু দ্রোণের বিপুল প্রভাব ও ক্ষাত্রবল আলোচনা করিয়া প্রতীকারের কোন পন্থাই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে দ্রোণের বিনাশের নিমিত্ত দৈবানুষ্ঠান দ্বারা পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত তিনি বহু ব্যয় ও আয়াসসাধ্য যজ্ঞের আয়োজন করেন এবং তাহার ফলেই পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কন্যা দ্রৌপদীর উৎপত্তি।

কথাটা কিন্তু গোপন রহিল না, চারিদিকেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কাম্পিল্য নগরীতে রাজা দ্রুপদের দ্রোণঘাতী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রাজা কংস শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি শুনিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিতে কত অনাচার অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে মহারথ দ্রোণের অন্তরে আশঙ্কার কোন শিহরণই উঠে নাই। তাঁহার চরিত্রগত কূটবুদ্ধির বিপরীত ক্রিয়াই ব্রাহ্মণোচিত উদারতা ও তিতিক্ষার প্রভাবে সুপ্রকাশ। মহাভারতের আখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রবল প্রতাপান্বিত দ্রোণ তাঁহার বন্ধুপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিজ আলয়ে আনাইয়া সযত্নে তাহার অস্ত্রশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নকেও ধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে হইল।

দশ দিন যুদ্ধ করিয়া মহারথ ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলে দুর্য্যোধন প্রিয়সখা কর্ণকে সেনাপতি মনোনীত করিতে বলিলেন। কর্ণ নির্দ্দেশ দিলেন,—শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় অভিজ্ঞ, শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য, দুর্দ্ধর্ষ

দ্রোণ বিদ্যমান থাকিতে আর কে সেনাপতি হইবে? দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিগণের শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমানদিগের অগ্রণী ও আপনার গুরু; সুতরাং আপনি শীঘ্রই দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি করুন।

দ্রোণাচার্য্য কিন্তু সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে জানাইলেন, তোমার জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব সত্য, কিন্তু কদাচ আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিতে পারিব না। সে আমার বধের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে।

ব্যূহ রচনায় দ্রোণের অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁহার সেনা পরিচালনা প্রসঙ্গে আমরা ইহার বিশেষ পরিচয় পাই। দ্রোণাচার্য্যের দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ সে যুগের যুদ্ধ ব্যাপারের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কোন ধনুর্দ্ধরই এই ব্যূহরহস্য সম্যক্ অবগত ছিলেন না। অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু পিতার নিকট চক্রব্যূহ ভেদের উপায় জানিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল না জানায় ব্যূহ মধ্যেই নিহত হন। দ্রোণের সৈনাপত্যকালে পাণ্ডব পক্ষে যুধিষ্ঠিরকে লইয়া মহাতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেন না, দুর্য্যোধন দ্রোণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন যুধিষ্ঠিরকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করিয়া আনেন। বুদ্ধিমান দ্রোণ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, যদি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধস্থলে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে ইহা সম্ভব হইতে পারে; সুতরাং যে উপায়ে পার, যুদ্ধস্থল হইতে অর্জ্জুনকে অপসারিত কর। দ্রোণাচার্য্যের এই পরামর্শ অনুসারেই অর্জ্জুনকে যুদ্ধান্তরে লিপ্ত রাখিতে দুর্য্যোধন ত্রিগর্ত্তদেশীয় দুর্দ্ধর্ষ সংশপ্তক এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত নারায়ণী সেনাবাহিনীকে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সময়েই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক ভীষণ অবস্থা উভয়পক্ষকেই স্তম্ভিত করিয়া দেয়।

দ্রোণাচার্য্যের পরিচালনাধীন সমরকাল পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কূটযুদ্ধের প্রবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডব পক্ষকে বিভ্রান্ত ও বিত্রস্ত করিলেও তিনি সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রুতির সুযোগে পাণ্ডবপতি যুধিষ্ঠিরকে ধরিবার প্রয়াস না করিয়া প্রকারান্তরে পরিহারই করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডব পক্ষে দুর্ব্বার বাধাসমূহ অতিক্রম করিয়া প্রায় প্রত্যহই তিনি যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সে সময় যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্যই ছিল; কিন্তু তিনি সে সুযোগ যেন ইচ্ছাপূর্ব্বকই অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন মনে হয়। তাঁহার এই ত্রুটি দেখিয়াই বিচক্ষণ রাজা দুর্য্যোধন চক্রব্যূহ রচনার পূর্ব্বদিন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ভাবেই দ্রোণাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন,—হে আচার্য্য! আমরাই আপনার বধ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি, কেন না, আপনি যুধিষ্ঠিরকে সমীপস্থ দেখিয়া আজও গ্রহণ করিলেন না! আপনি যাহাকে ধরিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন, সে কদাচ পরিত্রাণ পাইতে পারে না। কিন্তু আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াও আমার আশা ভঙ্গ করিতেছেন!

দুর্য্যোধনের এই কথাটা দ্রোণকে লজ্জা দিয়াছিল। মহাভারতেই এই প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ সেনাপতি তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, আমার সম্বন্ধে এমন ধারণা তুমি পোষণ করিও না; তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে আমি সর্ব্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছি। কিন্তু তোমাকে প্রথমেই ত বলিয়াছি, অর্জ্জুন-রক্ষিত যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করা বড়ই কঠিন। যাহা হউক, তুমি অর্জ্জুনকে যেমন যুদ্ধান্তরে লিপ্ত রাখিতেছ, তেমনই করিতে থাক। আগামী কল্য আমি এ সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিব। আর আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে,কল্যকার যুদ্ধে দেবতাদেরও দুর্ভেদ্য এক ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডব পক্ষের এক মহারথকে নিধন করিব।

দুর্য্যোধনকে তুষ্ট করিতে এ সত্য তিনি পরদিন রক্ষা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা কি মর্ম্মান্তিক! অর্জ্জুনকে তুষ্ট করিতে শিষ্যস্থানীয় একলব্যের নিকট বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণা প্রার্থনার মত, দুর্য্যোধনকে পরিতুষ্ট করিতে দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ রচনা ও তাহার মধ্যে অর্জ্জুনপুত্র মহারথ অভিমন্যু বধের শোচনীয় স্মৃতি দ্রোণের যুদ্ধকালকে কি ভয়াবহ করিয়া রাখিয়াছে!

মনে হয় যে, যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ মধ্যে আবদ্ধ অভিমন্যুর বিনাশ দ্বারা পাণ্ডবদের স্তব্ধপ্রায় প্রতিহিংসাবহ্নির ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। অভিমন্যুবধের বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া সিন্ধুপতি দুর্দ্ধর্ষ জয়দ্রথকে ব্যূহদ্বার রক্ষায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। জয়দ্রথ সেদিন এমন অপূর্ব্ব কৌশলে ব্যূহদ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন যে, ভীমাদি পরাক্রান্ত যোধগণ কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া ব্যূহমধ্যে বিপন্ন অভিমন্যুর সাহায্যার্থ যাইতে সমর্থ হন নাই। অর্জ্জুন কিন্তু অভিমন্যু বধের জন্য দ্বারপথরোধকারী জয়দ্রথকেই হেতু মনে করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, পরদিন সূর্য্যাস্তের মধ্যে তিনি জয়দ্রথকে নিহত করিবেন। জয়দ্রথ জীবিত থাকিতে যদি দিবাকর অস্তগত হন, তাহা হইলে যুদ্ধস্থলেই তিনি প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মাহুতি দিবেন।

অর্জ্জুনের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কৌরব-শিবির বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। জয়দ্রথও আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রিতেই তিনি দ্রোণাচার্য্যের শরণাপন্ন হইলেন। দ্রোণ তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন,—তোমাকে অর্জ্জুনের নিমিত্ত ভীত হইতে হইবে না; আমি তোমাকে ভয় হইতে রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। কল্য আমি এমন এক অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিব যে, অর্জ্জুন তাহা কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, ভীত হইও না।

কিন্তু এইরূপ আশ্বাস দিবার পর উপসংহারে পুনরায় দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন,—মৃত্যু তোমার পক্ষে ভয়ঙ্কর জয়। যদি তুমি অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে নিহতই হও, তাহা হইলে তুমি মনুষ্যগণের দুর্লভ মহাভাগ্য লাভ করিয়া দিব্য গতি পাইবে।

পরদিন দ্রোণাচার্য্য যে নূতন ব্যূহ রচনা করিলেন, তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চার্দ্ধ পক্ষের মত। সমগ্র ব্যূহের দৈর্ঘ্য চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ এবং বিস্তৃতি দশক্রোশ। পশ্চার্দ্ধস্থিত পক্ষাকৃতি ব্যূহমধ্যে সূচী নামে আর একটি গূঢ় ব্যূহ সন্নিবেশিত হইল। মূল ব্যূহ হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী এই সূচী ব্যূহমধ্যে জয়দ্রথ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, শল্য, দুঃশাসন, বৃষসেন এই সাতজন মহারথ এবং একলক্ষ দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী এক লক্ষ ষাট হাজার রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র মত্ত হস্তী ও একবিংশতি সহস্র বর্ম্মধারী পদাতি পরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের নির্দ্দেশে সুরক্ষিত হইলেন। শকটব্যূহের রক্ষার্থ মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য নৃপতি এবং বহু সংখ্যক রথ, অশ্ব, গজ ও পদাতি সংস্থাপন করিয়া সেনাপতি দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং অন্তকের ন্যায় ব্যূহ মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষ দ্রোণ-নির্ম্মিত ক্ষুব্ধার্ণব সদৃশ এই অদ্ভুত ব্যূহ সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

ব্যূহমুখে আসিবার পথটিও দুর্য্যোধনের অনুজ দুঃশাসন ও দুর্ম্মর্ষণের নেতৃত্বে বহুসংখ্যক মত্ত মাতঙ্গদ্বারা বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া রাখা হইয়াছিল। গজবাহিনী বিধ্বস্ত করিয়া ব্যূহমুখে আসিতেই দ্রোণাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে অর্জ্জুন তখন কৃতাঞ্জলিপুটে আচার্য্যকে কহিলেন,—হে তাত! আমি আপনাকে পিতার সমান, শ্রীকৃষ্ণের সমান ও জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সমান জ্ঞান করিয়া থাকি। আপনি অশ্বত্থামাকে যেরূপ রক্ষা করিয়া থাকেন, আমাকেও সেইভাবে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। আপনারই অনুগ্রহে আমি রণস্থলে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনাশ করিতে আসিয়াছি, আপনি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন।

দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রার্থনার উত্তরে হাসিমুখে জানাইলেন,—আমাকে অগ্রে জয় না করিয়া তুমি কিছুতেই জয়দ্রথকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

অতঃপর ব্যূহমুখে দ্রোণার্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধের যে বিবরণ মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে দ্রোণের উৎকর্ষেরই সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ এই সময় অর্জ্জুনকে পরামর্শ দিলেন,—আমাদের আর কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নয়। দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া জয়দ্রথের উদ্দেশে গমন করাই শ্রেয়।

অর্জ্জুন তদনুসারে দ্রোণকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বিবৃত্তমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলে, দ্রোণ তাঁহাকে শ্লেষের স্বরে কহিলেন,—কোথায় যাইতেছ অর্জ্জুন! তুমি না সমরে শত্রু পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হও না।

অর্জ্জুন সবিনয় উত্তর দিলেন,—হে আচার্য্য! আপনি আমার গুরু, শত্রু নহেন। আমি আপনার পুত্রতুল্য শিষ্য। আমার সাধ্য কি আপনাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারি?

ব্যূহমধ্যে দ্রোণের পশ্চাতে ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ সসৈন্য প্রস্তুত ছিলেন। দ্রোণকে অতিক্রম করিয়া অর্জ্জুন সেই পথে অগ্রসর হইলেন। দ্রোণ যে অর্জ্জুনের উক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাধা দিবার বিশেষ চেষ্টা করেন নাই, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শুধু অর্জ্জুনকে নয়, ব্যূহপ্রবেশে অর্জ্জুনের পৃষ্ঠরক্ষগণকেও এ সময় ব্যূহপ্রবেশে তিনি বিশেষ বাধা দেন নাই।

প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের প্রতি অনুরাগনিবন্ধন দ্রোণের এই দুর্ব্বলতার তথ্যটুকু অবগত হইয়াই দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ রথারোহণে দ্রোণ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া এসম্বন্ধে তাঁহার নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিয়াছিলেন।

এমন কি, তাঁহাকে মধুলিপ্ত ক্ষুর বলিয়া অনুমান করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান ও বাকপটু দ্রোণ অতিশয় সংযতভাবে দুর্যোধনের প্রশ্নের যে উত্তর দিলেন, তাহা যেমন সময়োচিত, তেমনই তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। দ্রোণ কহিলেন,—মহারাজ দুর্য্যোধন! তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামার তুল্য। তোমার বাক্যে দোষারোপ করি না। কিন্তু তুমি কি জ্ঞাত নহ যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ সারথি, তাঁহার অশ্বসকল অতিশয় বেগগামী এবং অর্জ্জুন অত্যল্পমাত্র পথ পাইয়াই দ্রুতগতিতে আমাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এদিকে পাণ্ডব-সেনা আমাদের সেনা-মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ, আমি পাণ্ডবপক্ষীয় ধনুর্দ্ধরদিগের সমক্ষেই যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; এক্ষণে যুধিষ্ঠিরও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত নহে, সে পাণ্ডব-সেনা মধ্যে অবস্থান করিতেছে। আমি এখন ব্যূহমুখ ত্যাগ করিয়া অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না, যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করাই আমার এখন লক্ষ্য। তুমি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া অর্জ্জুনকে নিবারণ কর। এস, আমি তোমার অঙ্গে মন্ত্রপূত এক দুর্ভেদ্য কবচ বাঁধিয়া দিতেছি।

দ্রোণের বাক্যে দুর্য্যোধনের মনের দ্বিধা কাটিয়া গেল, তিনি তখন দ্রোণদত্ত কবচ ধারণ করিয়া ও বহু বলপরিবেষ্টিত হইয়া অর্জ্জুনের উদ্দেশে ধাবিত হইলেন। এদিকে রণস্থলে যুধিষ্ঠিরকে পাইয়া এবং দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াও দ্রোণ তাঁহাকে গ্রহণ সম্পর্কে যেন উপেক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। পক্ষান্তরে পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য ধনুর্দ্ধরগণের সহিত সংগ্রামে দ্রোণ যেন কালান্তক যমের মতই নির্ম্মম হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। বহু বিশিষ্ট ধনুর্দ্ধর এদিন দ্রোণের হস্তে নিহত হন। পাঞ্চাল-রাজবংশের বীরকেতু, সুধন্বা, চিত্রকেতু, চিত্রবর্ম্মা, চিত্ররথ প্রমুখ রাজপুত্রগণের নাম

নিহতগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পাঞ্চালগণের উদ্দেশ্যে দ্রোণের রোষানল এদিন যেন দুর্ব্বারগতিতে উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে গর্ভ-বূহ্যমধ্যে সন্তর্পণে রক্ষা করা সত্ত্বেও অর্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। জয়দ্রথের পতনে কৌরব-বাহিনী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল। দুর্য্যোধন দেখিলেন, শুধু জয়দ্রথ নহে, তাহার সহিত তাঁহার কতিপয় ভ্রাতা এবং অনুগত বহু নৃপতি ও অসংখ্য যোদ্ধা আত্মাহুতি দিয়া অভিমন্যুবধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। তিনি অতঃপর দ্রোণাচার্য্যের সন্নিধানে গিয়া অভিমান-ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণের আচার্য্য! আপনি অর্জ্জুনকে শিষ্য বলিয়া উপেক্ষা করিতেই আমাদের বিজয়াভিলাষী মহাবীরগণ নিহত হইয়াছেন। এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের অনুগমনে সমুৎসুক হইয়াছি, আপনি ইহাতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

দ্রোণাচার্য্য এবার দুর্য্যোধনকে মর্ম্মস্পর্শী স্বরে তাঁহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত অপকর্ম্মগুলির উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—হে দুর্য্যোধন! তুমি সেই সকল অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছ। আমি ত তোমাকে সর্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছি যে, অর্জ্জুন অজেয়। শিখণ্ডী অর্জ্জুন সংরক্ষিত হইয়া মহাবীর ভীষ্মকে নিপাতিত করাতেই অর্জ্জুনের অসাধারণ বলবীর্য্য অবগত হওয়া গিয়াছে। তোমরা ত সকলেই মহাবলসম্পন্ন ভূপালগণের সহিত জয়দ্রথকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রখর তেজ ধারন করিয়াছিলে, তবে তিনি কেন অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইলেন? তুমি আমাকে বৃথা বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছ। যাই হউক, আমি তোমার হিতানুষ্ঠানে পাণ্ডবগণের পরম সহায়ক পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে আজ বিনাশ না করিয়া কবচ মোক্ষণ করিব না। যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতেছি যে, পাণ্ডবগণ রজনীযোগেও যুদ্ধে নিবৃত্ত হইবেন না। তোমার বাক্যশল্যে

পীড়িত হইয়া আমি সংগ্রাম করিতে চলিলাম। তুমি আমার পুত্র অশ্বত্থামাকে আমার নির্দ্দেশ জ্ঞাপন কর যে, পাণ্ডবদিগের অন্যতম সহায়ক সোমকদিগের বিরুদ্ধে সে যেন যুদ্ধ পরিত্যাগ না করে—জীবন-পণ করিয়া তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে প্রয়াস পায়।

অতঃপর হতাবশিষ্ট কুরু-বাহিনীকে সুসজ্জিত করিয়া দ্রোণাচার্য্য এক নূতন ব্যূহ রচনা করিলেন। তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ জয়দ্রথবধে ভগ্নোদ্যম কুরু-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিবার এই উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া নিশাগম সত্ত্বেও নৈশযুদ্ধে অভিজ্ঞ সোমক, সৃঞ্জয় ও রাক্ষসবৃন্দের সহকারিতায় যুদ্ধ চালাইতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। কুরুক্ষেত্রে ইহাই প্রথম নৈশযুদ্ধ। দুর্য্যোধনের প্রতি দ্রোণের উক্তি হইতেই উপলব্ধি হয় যে, পাণ্ডবপক্ষই এই নৈশযুদ্ধের প্রবর্ত্তক এবং ইহার মূলে একটি উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল।

সোমকগণ পাণ্ডব সেনাবাহিনীর পুরোভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিল এবং অশ্বত্থামা সোমকদিগকে পর্যুদস্ত করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শিখণ্ডী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন যথাক্রমে ভীষ্ম ও দ্রোণকে নিহত করিবার জন্য দ্রুপদকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ইহা প্রবাদের মত সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। শিখণ্ডীই ঘটনাচক্রে ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যুর উপলক্ষ হইলে দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু সম্পর্কেও ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবগণের নিকট আতঙ্কজনক হইয়া উঠিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য যদিও ধৃষ্টদ্যুম্নকে শস্ত্রশিক্ষা দিয়াছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র রণস্থলে বহুবার এই পাঞ্চাল রাজপুত্রকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি নিজেও এরূপ আশঙ্কা পোষণ করিতেন যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার কালস্বরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি তাঁহার বধ্য নহেন। এ অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার জন্য অশ্বত্থামার বিপুল প্রয়াস স্বাভাবিক।

অর্জ্জুনকে যুদ্ধান্তরে লিপ্ত করিবার জন্য কৌরবগণ যেমন তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ দত্ত নারায়ণী সেনাদল চালনা করিয়াছিলেন, অশ্বত্থামাকে তদ্রূপ বাধা দিবার জন্য পাণ্ডবগণ তাঁহাদের পক্ষভুক্ত সোমকগণকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই দুর্য্যোধন নৈশযুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার সেনা বাহিনীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—তোমরা মিলিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন হইতে দ্রোণাচার্য্যের রক্ষণে যত্নবান হও। তোমরা তাঁহাকে রক্ষা করিলে পাণ্ডব পক্ষের সোমক ও সৃঞ্জয়গণ সদলে উন্মূলিত হইবে এবং তাহা হইলে অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা রণস্থলে আচার্য্যকে রক্ষা কর।

অতঃপর ভয়ঙ্কর নৈশযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে সঞ্জয় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন,—হে মহারাজ! সেই রাত্রিকালে যেরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ যুদ্ধ আমাদিগের বা পূর্ব্বতন লোকদিগের কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

এই রাত্রিযুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃপুনঃ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিয়াও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না। বরং দ্রোণাচার্য্যই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পাণ্ডবপক্ষের বহু বিশিষ্ট বীরকে তাঁহার সম্মুখে নিহত করিলেন। কর্ণও কালান্তক যমের মত পাণ্ডব বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে এই সঙ্কটসময় ভীমপুত্র ঘটোৎকচ কর্ণের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পাণ্ডবপক্ষের মহারথবৃন্দ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিতে চলিলেন।

কিন্তু দ্রোণ ও কর্ণ উভয়েই যেন আজ পরাস্ত হইবেন না। পণ করিয়াই যুদ্ধ করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণের দুই বিশিষ্ট বৈবাহিক, দিক্‌পাল সদৃশ দুই নৃপতি, পাণ্ডবপক্ষের পরম শ্রদ্ধাভাজন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ এবং মৎস্যাধিপতি বিরাট এই নৈশযুদ্ধে দ্রোণের হস্তে নিহত

হইলেন। তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদিক্রমে বহু সন্তান সন্ততিও দ্রোণের শরাঘাতে জীবন হারাইলেন। পাণ্ডবপক্ষে হাহাকার পড়িয়া গেল। পিতৃশোকে উন্মত্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন কঠোর শপথ করিয়া দ্রোণাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

এমন সময় তপ্তকাঞ্চনভাস্বর ভাস্করের প্রকাশে সমুদয় রণস্থল পরিদৃশ্যমান হইল। বর্ম্মধারী বীরবৃন্দ সেই রণক্ষেত্রেই নবোদিত দিবাকরের উদ্দেশে উপাসনা করিলেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণাচার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অতি নিদারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দুর্দ্ধর্ষ দ্রোণের প্রচণ্ড পরাক্রম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—সশস্ত্র দ্রোণকে নিহত করা দেবতাদেরও অসাধ্য। কিন্তু নিরস্ত্র দ্রোণকে যে কোন মনুষ্য অনায়াসেই বধ করিতে পারে। অতএব তোমরা কৌশল প্রয়োগে দ্রোণকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা কর, নতুবা তিনি সকলকেই আজ বিনাশ করিবেন। আমার মনে হয় যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে। এরূপ কোন সংবাদ যদি দ্রোণ শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অস্ত্রত্যাগ করিবেন। এক্ষণে কেহ তাঁহার নিকট গিয়া এই মিথ্যা সংবাদটি প্রদান করুক।

ভীম এই কথা শুনিয়া অশ্বত্থামা নামক একটি হস্তীকে বধ করিলেন এবং দ্রোণের নিকট গিয়া সংবাদ দিলেন,—অশ্বত্থামা যুদ্ধে হত হইয়াছে দ্রোণ কিন্তু ভীমের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, আরও সাংঘাতিক ভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের প্রহারে মৃতকল্প; তাঁহার সম্মুখেই দ্রোণ পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও মৎস্য দেশীয় বহু মহারথকে নিহত করিলেন। নিজের সংহারলীলায় দ্রোণ নিজেই চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিতেছিল যে, পরশুরামের মত তিনিও কি পুনরায় ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

এই সময় পাণ্ডবপক্ষ হইতে দ্রোণের উদ্দেশে পুনঃপুনঃ শোকবার্ত্তা ঘোষিত হইতে লাগিল,—হে ব্রাহ্মণ! অশ্বত্থামা বিনষ্ট হইয়াছে, আর কেন আপনি যুদ্ধ করিতেছেন?

দ্রোণ এই সংবাদে উন্মনা হইলেন, কিন্তু আস্থাস্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা যে যুদ্ধস্থলে অজেয়, তাহার মৃত্যু নাই, দ্রোণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই সময় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—দ্রোণাচার্য্য রোষপরবশ হইয়া যদি আর অর্দ্ধদিন যুদ্ধ করেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। আপনি অশ্বত্থামা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা কহিয়া সকলকে পরিত্রাণ করুন। প্রাণরক্ষার্থ কিম্বা গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ মিথ্যা সত্যের সমকক্ষ; তাহাতে পাতক নাই।

যুধিষ্ঠির তখন জয়াভিলাষে আকৃষ্ট ও মিথ্যাভাষণ ভয়ে বিমুখ এই দুই ভাবে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া দ্রোণ সমক্ষে সুস্পষ্ট স্বরে কহিলেন যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছেন এবং অস্পষ্ট ও মৃদুস্বরে তাহার সহিত 'ইতি গজ' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মুখে পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র ত্যাগ করিয়া যোগাসীন হইলেন। মহাভারতের এইস্থলে দ্রোণের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

জ্যোতির্ম্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগ সহকারে অনাদি পুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বসন পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক একান্ত মনে বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করিয়া সাধুজনেরও দুর্ল্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

ঠিক এই সময় ধৃষ্টদ্যুম্ন মোহবশতঃ অস্ত্রত্যাগী যোগারূঢ় মৌনাবলম্বী

গতাসু দ্রোণাচার্য্যকে জীবিত ভাবিয়া অসি দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন পূর্ব্বক শপথ রক্ষার আনন্দে আত্মহারা হইলেন।

তরুণ যুবার শৌর্য্য লইয়া যে বীরশ্রেষ্ঠ মহাবল পাণ্ডবগণকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়সে এইভাবে তিনি জীবন ব্রত উদ্‌যাপন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র

মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্র বিশেষ রহস্যময়। এই জটিল চরিত্রটির দুইটি দিক্ আমাদের চক্ষুর উপর যেন দৃষ্টি-বিভ্রম উপস্থিত করে। কখনও দেখিতে পাই, তিনি অতিশয় সরল, অসাধারণ স্নেহপ্রবণ, একান্ত উদারচিত্ত; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার শঠতাপূর্ণ আচরণ, কূট-বুদ্ধির পরিকল্পনা ও স্বার্থসিদ্ধির গূঢ় অভিসন্ধি আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয়।

ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে ব্যাসোক্তি এইরূপ

নাগাযুতসমপ্রাণো বিদ্বান্ রাজর্ষিসত্তমঃ।
মহাভাগো মহাবীর্য্যো মহাবুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥

পাণ্ডু যখন রাজা হইলেন, ধৃতরাষ্ট্র তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এমন কথা মহাভারতে নাই। পাণ্ডুর রাজত্বকালে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার অসদ্ভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং এক্ষেত্রে দুই ভ্রাতার মধ্যে পরম সম্প্রীতির নানারূপ কাহিনীর সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। পাণ্ডু নিজের অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠের প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি পাণ্ডুর বিপুল শ্রদ্ধা রামায়ণে চিত্রিত লক্ষ্মণ ও ভরতের অসামান্য জ্যেষ্ঠানুরক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দিগ্বিজয়ের পর হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি-ক্রমে বাহুবলার্জ্জিত ধন-সম্পদ্ ভীষ্ম, সত্যবতী ও দুই জননীকে উপহার দিলেন। যথা—

ধৃতরাষ্ট্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ স্ববাহুবিজিতং ধনম্।
ভীষ্মায় সত্যবত্যৈ চ মাত্রে চোপজহার সঃ ॥

তাহার পর পাণ্ডু যখন ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে বসাইয়া বনযাত্রা করিলেন, আমরা দেখিতে পাই যে, সে সময়ও দুই ভ্রাতার মধ্যে যোগসূত্র অক্ষুন্ন রহিয়াছে।—ধৃতরাষ্ট্র নিয়মিতভাবে রাজভোগ্য খাদ্য ও বিলাস দ্রব্যসমূহ সযত্নে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধানে সুদূর অরণ্য অঞ্চলে প্রেরণ করিয়া থাকেন—যাহাতে বনমধ্যে তাঁহাদিগের কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না ঘটে।

কিন্তু ইহার অব্যবহিতকাল পরেই বিহারশীল মৃগবধজনিত মনস্তাপে পাণ্ডু অনুচরবর্গকে বিদায় দিয়া দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রস্থান করিলে, হস্তিনা ও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের সম্বন্ধে এরূপ অনুযোগের উল্লেখও মহাভারতীয় কথায় পাওয়া যায় যে, ভার্য্যাদির সহিত পাণ্ডু বনপ্রদেশে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—ইহাই তিনি স্থির করিয়াছিলেন এবং পুরবাসীদিগকেও এরূপ আভাস দিয়াছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে যখন শতশৃঙ্গ পর্ব্বতবাসী তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মর্ষিগণ বিধবা কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের সহিত পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ লইয়া হস্তিনাপুরের দ্বারে উপনীত হইলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র সমীপে তাঁহাদিগের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন, সে সময় ধৃতরাষ্ট্র কুরুবংশের আবাল বৃদ্ধ-বনিতা, অমাত্য পুরোহিত ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ পরিবৃত হইয়া যে ভাবে নগরীর বহির্দ্দেশে কুরুজাঙ্গল নামক স্থানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে তাঁহার মহত্বই সূচিত হয় এবং এখানেও আমরা তাঁহার রাজোচিত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই। তিনি তৎক্ষণাৎ বিপুল আড়ম্বরে পাণ্ডু ও তাঁহার মহিষী মাদ্রীর সংকারের আদেশ দিলেন এবং কুন্তী ও পঞ্চ-পাণ্ডবকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আদেশে পাণ্ডু ও মাদ্রীর যে ধন-সম্পদ হস্তিনার প্রাসাদে সুরক্ষিত ছিল, সে

সমস্তই প্রার্থীদিগকে বিতরণ করা হইল। মহাসমারোহে পাণ্ডু ও মাদ্রীর শ্রাদ্ধাদিও সম্পন্ন হইয়া গেল।

অন্ধ হইলেও ধৃতরাষ্ট্র সাম্রাজ্যের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। পাণ্ডবগণ যে ক্রমশঃই বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছেন, পৈতৃক সিংহাসনের দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি যে নিবদ্ধ রহিয়াছে, নানাসূত্রেই তিনি তাহা অবগত হইলেন। মনে মনে এইরূপ আলোচনায় তাঁহার চিত্ত যখন চঞ্চল ছিল, ঠিক সেই সময় পিতার মনের অবস্থা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দুর্য্যোধন তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, পৌরগণ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে একান্ত লালায়িত হইয়াছে এবং রাজ্যভোগ-পরাঙ্মুখ ভীষ্মেরও উহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। পিতাকে তিনি ইহাও বুঝাইলেন যে, পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার বংশীয়েরাই রাজমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে, পক্ষান্তরে ধৃতরাষ্ট্রের বংশধরগণ কুরু-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও জনগণের নিকট হীন ও অবজ্ঞাত হইয়া রহিবে।

এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্ণয়ের জন্য ধৃতরাষ্ট্র যে বিচক্ষণ সচিবকে আহ্বান করিলেন, তাঁহার নাম কণিক। মন্ত্রজ্ঞ ও নীতিনিপুণ বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, পরের মর্ম্মচ্ছেদ না করিয়া কিম্বা ধীবরের মত বিনা অপরাধে ব্যাপকভাবে হত্যা না করিয়া কদাচ বিশাল সম্পদ লাভ করা যায় না। সময়োপযোগী ছেদনদক্ষ সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর হইয়া শত্রু সংহার করা উচিত। নচেৎ, ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে।

কণিকের মন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র কতকটা আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বার্থ-সম্পর্কে পাণ্ডুর পুত্রদিগের সহিত শত্রুবৎ কঠোর আচরণ করিতে হইবে ভাবিয়া চিন্তিতও হইলেন। চিত্তের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শ্যালক শকুনিকে আহ্বান করিয়া জানিতে চাহিলেন যে, এ সম্বন্ধে তাঁহার কি

অভিমত। শকুনি একেবারে চরম মন্ত্রণাই দিলেন। সেই মন্ত্রণার সাংঘাতিক ফল—বারণাবত পরিদর্শনে পাঠাইবার ছলে কুন্তীসহ পঞ্চ পাণ্ডবকে জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ করিয়া বিনাশ! একদিন এই ধৃতরাষ্ট্রই হস্তিনাপুরের দ্বারে কৌরব ও পৌরজন-পরিবৃত হইয়া মহর্ষিগণ কর্তৃক আনীত শোকার্ত্ত পাণ্ডবগণকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার ইনিই কিছুকাল পরে স্বার্থানুরোধে স্থান পরিদর্শনের ছলে তাহাদিগকে বারণাবতে পাঠাইয়া দিলেন শোচনীয় মৃত্যুর করাল কবলে।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের এমনই প্রভাপ যে, তাঁহার এই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়াও বিদুরের ন্যায় ধর্ম্মপরায় ভ্রাতা ও সচিব প্রকাশ্যে কোনরূপ প্রতিবাদ তুলিতে পারেন নাই; তবে তিনি যাত্রাকালে বারণাবতগামী যুধিষ্ঠিরকে যে সঙ্কেত-বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা উপলব্ধি করিয়াই পাণ্ডবগণ নিষ্কৃতির উপায় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন।

ইহার পর জতুগৃহ দগ্ধ হইবার বার্ত্তা যখন ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণগোচর হইল, তখন কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের উদ্দেশে তাঁহার কি হৃদয়বিদারী বিলাপ! পাণ্ডুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া তিনি যেরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, এ অবস্থায়ও সেইরূপ বিচলিত হইয়া তিনি কহিলেন,—হায়! মাতার সহিত যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ বিনষ্ট হওয়াতে এতদিন পরে আমার ভ্রাতা পাণ্ডু মৃত হইলেন। আমার অধীনস্থ পুরুষগণ অবিলম্বে বারণাবত নগরে গমন করিয়া তাঁহাদের প্রেতদেহের তৃপ্তির উদ্দেশে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া স্মৃতিরক্ষায় অবহিত হউক। যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে, এক্ষণে কুন্তী ও তাঁহার পুত্রগণের পারত্রিক হিতসাধন সম্বন্ধে যে কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ শুনিয়া বিদুর অবশ্যই মনে মনে হাসিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠের সহিত তাঁহাকেও তৎকালে কৃত্রিম বিলাপ করিতে হইয়াছিল।

কিছুকাল পরে পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সূত্রেই প্রকাশ পাইল যে, পঞ্চপাণ্ডব জীবিত আছেন এবং ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে যিনি লক্ষ্যভেদ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, তিনিই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন।

বিদুর এই সময় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—'মহারাজ ভাগ্যবলে কৌরবরাই স্বয়ম্বর-সভায় জয়মাল্য পরিয়াছেন।' ধৃতরাষ্ট্র সম্ভবতঃ স্বয়ম্বর-বার্ত্তার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, এই শুভ সংবাদটি শুনিয়াই তিনি সোল্লাসে কহিলেন,—'কি সৌভাগ্য বিদুর! কি সুসংবাদই তুমি আমাকে শুনাইলে! দুর্যোধনকে বল যে, সে যেন মূল্যবান বসনভূষণে সাজাইয়া দ্রৌপদীকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করে।'

বিদুর তখন কথাটা খুলিয়া বলিলেন,—'মহারাজ! দুর্য্যোধন নয়, দ্রৌপদী সম্বন্ধে পঞ্চপাণ্ডব জয়মাল্য পাইয়াছেন। তাঁহারা বারণাবতে দগ্ধ হন নাই, কুশলেই আছেন এবং স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীকে লাভ করায় বহু বহু বান্ধব তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন।'

ধৃতরাষ্ট্র এই অপ্রত্যাশিত কথাটার কোন প্রতিবাদ বা এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করিয়াই অম্লান বদনে কহিলেন,—ভালই হইয়াছে, ইহাও কি সুখের কথা নহে!

যথৈব পাণ্ডোঃ পুত্রাস্তে তথৈবাভ্যধিকা মম।
যথা চাভ্যধিকা বুদ্ধির্মম তান প্রতি তচ্ছৃণু॥

আঃ ২০০।২৩

অর্থাৎ—তাহারা পাণ্ডুর পুত্র বটে, কিন্তু আমি তাহাদিগকে নিজের সন্তান অপেক্ষাও অধিক মনে করি। আমার পুত্রগণ অপেক্ষাও যে তাহারা আমার অধিক স্নেহভাজন। যাহা হউক, তাহারা যে কুশলে আছে এবং সবান্ধব পাঞ্চালরাজকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া

অধিকতর কুশলী হইয়াছে, ইহাতে তাহাদিগের প্রতি আমার আরও অধিক প্রীতি হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্রের মুখে এই প্রকার উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তি শুনিয়া বিদুর তাঁহাকে কহিলেন,—আপনার এই সুবুদ্ধি শতবর্ষ স্থায়ী হউক।

এই ঘটনার পর ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সম্বন্ধে আলোচনার জন্য মন্ত্রণাসভা আহ্বান করিলেন। ভীষ্ম পরামর্শ দিলেন যে, প্রীতিপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করা উচিত। দ্রোণ জানাইলেন যে, মহাত্মা ভীষ্মের সহিত তিনিও একমত। বিদুর কহিলেন, নাগরিক ও জনপদবাসী সকলেই পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন শুনিয়া অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আপনার উচিত।

এসম্বন্ধে কর্ণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র সেই মন্ত্রণাসভায় দৃঢ়স্বরে নির্দ্দেশ দিলেন যে, কুন্তীতনয়েরা যেরূপ পাণ্ডুর পুত্র, সেইরূপ ধর্ম্মানুসারে আমারও পুত্র এবং আমার পুত্রেরা এই রাজ্যে যেমন অধিকারী, পাণ্ডুপুত্রেরাও সেইরূপ অধিকারী; সুতরাং বিদুর অবিলম্বে বিবিধ ধনরত্ন সহ পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করুন এবং সমাতৃক পাণ্ডবগণ ও দেবীরূপিণী কৃষ্ণাকে উত্তমরূপ সংকৃত করিয়া হস্তিনাপুরীতে আনয়ন করুন।

ধৃতরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত হইতে মনে হয় যে, সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিতে তিনি অতিশয় দক্ষ ছিলেন। পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থা পাণ্ডবদের অনুকূল দেখিয়া এই ভাবেই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সহৃদয়তার আবরণ টানিয়া তিনি বারণাবত সংক্রান্ত অপ্রীতিকর ঘটনাটির উপর যবনিকা ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

শুধু বিদুরকে পাঠাইয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। পাণ্ডবগণ বিদুর, কুন্তী ও দ্রৌপদীর সহিত হস্তিনাপুরে আসিতেছেন শুনিয়াই তিনি আচার্য্য

দ্রোণ ও কৃপের সহিত বিকর্ণ ও চিত্রসেন নামক পুত্রদ্বয়কে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত পাঠাইলেন। তাঁহারা যথাসময় রাজধানীতে উপনীত হইলে ধৃতরাষ্ট্রের সু-ব্যবহারে হস্তিনার রাজভবনেই বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্যের অধিকার পাইয়া খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে বাধ্য হন এবং কালক্রমে তাহা ইন্দ্রপ্রস্থ নামে সুবিখ্যাত হইয়া উঠে।

মনে হয়, পাণ্ডবগণকে সমাদরে গ্রহণ ও অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিয়া বারণাবতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল ভাবিয়া ধৃতরাষ্ট্র অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। খুব সম্ভব, এ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোনরূপ দুরভিসন্ধি স্থান পায় নাই। কেন না, কয়েক বৎসর পরে ইন্দ্রপ্রস্থে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত রাজসূয় যজ্ঞে পাণ্ডবগণের দীপ্তিমতী রাজশ্রী সন্দর্শনে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া দুর্য্যোধন দৃঢ়তার সহিত তাঁহার নিকট বিক্ষোভ প্রকাশ করিলে, তিনি তখন পুত্রকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন,—'মোহ বশে কি নিমিত্ত তুমি ভ্রাতার শ্রী কামনা করিতেছ? পরধনে স্পৃহা নীচাশয়ের কর্ম্ম; যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মস্থ হইয়া স্বীয় ধনে সন্তুষ্ট থাকেন, সংসারে তিনিই সুখী হন। পাণ্ডুর পুত্রদিগের প্রতি কদাচ দ্বেষ করিও না। যজ্ঞীয় যশ যদি তুমিও আকাঙ্ক্ষা কর, তবে পুরোহিতগণ তোমার জন্য সপ্ততন্তু নামক মহাযজ্ঞের আয়োজন করুন। ভূপালমণ্ডলী বহুমানপূর্ব্বক প্রীতি সহকারে তোমার জন্য বিপুল ধন ও রত্নরাজি আহরণ করিবেন।

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের যুক্তি দুর্য্যোধনের অন্তর স্পর্শ করিল না, তিনি প্রার্থনা করিলেন যে, অক্ষবিদ্যায় পারদর্শী মাতুল শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য্য আহরণে উৎসাহী হইতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে অনুমতি করুন।

ধৃতরাষ্ট্র শুদ্ধভাবেই পুত্রের এই প্রস্তাব শুনিলেন। দ্যূতক্রীড়ার

প্রভাব এবং এ সম্বন্ধে শকুনির দক্ষতা তাঁহার অবিদিত ছিল না। পক্ষান্তরে ইহাও তিনি জানিতেন যে, দ্যূতে যুধিষ্ঠিরের বিশেষ প্রীতি থাকিলেও তিনি তাদৃশ ক্রীড়াপটু নহেন। পুত্রগণের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আবার এক প্রলোভন তাঁহার সম্মুখে মোহজাল বিস্তার করিল। কিন্তু তিনি চিত্তকে দৃঢ় করিয়া পুত্রকে কহিলেন,—তুমি ত জান, বিদুর আমার মন্ত্রী, তাঁহার পরামর্শেই আমি অবহিত আছি। আমি এ সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিব এবং আমার বিশ্বাস, তিনি উভয় পক্ষের হিতকর সুপরামর্শই দিবেন।

কথাটা দুর্যোধনের মনঃপূত হইল না, তিনি কহিলেন,—আপনি যদি বিদুরের নিকট পরামর্শপ্রার্থী হন, তিনি আপনাকে নিবৃত্ত করিবেন। কিন্তু আপনি নিবৃত্ত হইলে, আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। আপনি তখন বিদুরকে লইয়াই সুখী হইবেন।

দুর্যোধনের এই অভিমান-ক্ষুব্ধ উক্তি ব্যর্থ হইল না, পুত্রস্নেহের আবর্ত্তে বৃদ্ধের চিত্ত বিঘূর্ণিত হইয়া গেল। বিদুরের সহিত পরামর্শ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন যে, রাজশিল্পকারগণ অতি সত্বর সহস্র স্তম্ভ ও শত দ্বার যুক্ত এক অতি মনোরম সুবিস্তীর্ণ সভামণ্ডপ নির্ম্মাণে অবহিত হউক। সভা নির্ম্মাণের আদেশ দানে দুর্যোধনের মনে উৎসাহদানের পর তিনি বিদুরকে আহ্বান করিলেন দ্যূত সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয়ের পরামর্শের জন্য। ইহা যেন ঠিক বিচার করিবার পূর্ব্বেই তাহার নিষ্পত্তি স্থির করিয়া রাখিবার মত একটা প্রহসন হইয়া দাঁড়াইল! দ্যূত সম্বন্ধে ধৃতরাষ্ট্রের গূঢ় অভিসন্ধি যেন ইহাতে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বিদুর সম্বন্ধে দুর্যোধন তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তিনিও মনে মনে তাহাই ধারণা করিয়াছিলেন। বিদুরের মত বিচক্ষণ মন্ত্রী কখনই

য দ্যুতের অনুকূলে মত প্রকাশ করিবেন না, ইহা তিনি জানিতেন এবং তাহা জানিয়াই তাড়াতাড়ি দ্যুত ক্রীড়ার উপযুক্ত বিরাট সভামণ্ডপ রচনার আদেশ দিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধনের মত বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরটি গ্রন্থের মতই আয়ত্ত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। সভা নির্ম্মাণের আদেশ প্রকাশ্যভাবেই ধৃতরাষ্ট্র দিয়াছিলেন। আদেশ শুনিয়া আর সকলে চমৎকৃত হইলেও বিদুর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইহার মূলে কি সর্ব্বনাশকর অভিসন্ধি নিহিত রহিয়াছে। ইহার পরেই তিনিও আহূত হইলেন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্র সমীপে গিয়াই তাঁহার চরণ দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন,—'আপনার এই সঙ্কল্পের অনুমোদন আমি কিছুতেই করিতে পারি না। পুত্রগণের মধ্যে যাহাতে ভেদ না হয়, আপনি তাহা করুন।'

বিদুর যেমন ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের সহিত পরিচিত ছিলেন, বিদুরের মত ভ্রাতৃবৎসল ধর্ম্মনিষ্ঠ দৈববিশ্বাসী মন্ত্রীকে বশীভূত করিবার মন্ত্রও তেমনি ধৃতরাষ্ট্র জানিতেন। স্বল্প কথায় তিনি বিদুরের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া বিদুরকেই দ্যুত ক্রীড়ার দৌত্যে নিয়োজিত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে কহিলেন,—"তুমি এ সঙ্কল্পকে আমার বলিয়া মনে করিতেছ কেন? সকলই দৈবের হাত, দৈব হইতেই ঘটিয়াছে। দৈব অনুকূল থাকিলে কোন বিপদ ঘটিবে না, অতএব তুমি নিশ্চিন্তমনে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর এবং ক্রীড়ার্থে যুধিষ্ঠিরকে আমার নিমন্ত্রণ জানাও।" বিদুর বিষণ্ণমনে রাজাজ্ঞা পালন করিতে চলিয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। দৈবের প্রসঙ্গ ভুলিয়া যে বিদুরকে তিনি বিদায় দিলেন, সেই বিদুরের উপদেশ উল্লেখ করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—'বিদুর কখন অন্যায় কথা বলেন না অথবা অহিতকর উপদেশ দেন না। তাঁহার যখন অমত, তখন আর দ্যুতে প্রয়োজন নাই।'

ইহার উত্তরে দুর্য্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তাঁহার অপমানের প্রসঙ্গটি তুলিয়া জানাইলেন যে—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে গিয়া তিনি অত্যন্ত অপদস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার লাঞ্ছনায় ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব এমন কি দ্রৌপদী পর্য্যন্ত হাসিয়াছেন। সুতরাং সে অপমানের প্রতিশোধ তাঁহাকে লইতেই হইবে। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র স্তব্ধ হইয়াই সে কাহিনী শুনিলেন। তাহার পর কহিলেন, তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই কর, কিন্তু ভবিষ্যতে যেন অনুতাপ করিতে না হয়।

দ্যূতারম্ভের পর অল্পক্ষণের মধ্যেই যুধিষ্ঠির যখন একে একে ইন্দ্রপ্রস্থের বিপুল ধন সম্পত্তি হারাইয়া রিক্ত হইলেন, সে সময় বিদুর অতিশয় বিক্ষুব্ধ হইয়া এই সাংঘাতিক ক্রীড়া বন্ধ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যে আবেদন জানাইলেন, তাহার উত্তর দিলেন দুর্য্যোধন। তাঁহার মুখে বিদুরের প্রতি তীক্ষ্ণ কটূক্তি শুনিয়াও ধৃতরাষ্ট্র নীরব রহিলেন। ইহাতে মনে হয় যে, বিজয়পর্ব্ব যখন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে, সে সময় বিদুরের সেই প্রতিবাদ তাঁহার মনে সন্তোষ আনয়ন করিতে পারে নাই।

অতঃপর ক্রীড়ামত্ত যুধিষ্ঠির অভিভূতের মত যখন পণে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে হারাইয়া নিজেও হারিলেন এবং অবশেষে অবশিষ্ট দ্রৌপদীকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, তখন সভাস্থ বৃদ্ধগণ ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে 'ধিক্' 'ধিক্' করিলেও ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য উৎফুল্ল দেখা গিয়াছিল। তিনি তখন আর মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'জিত হইল কি ?'

ইহার পর এই ভয়াবহ দ্যূতের পরিণতি যখন চরম অবস্থায় উপনীত হইল, দুর্য্যোধনের আদেশে দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভাস্থলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং লাঞ্ছিতা পাণ্ডব-মহিষী যখন আর্ত্তস্বরে কুরুবংশীয় বৃদ্ধগণের উদ্দেশে মর্ম্মবাণী জানাইলেন, তখনও

ধৃতরাষ্ট্র নির্ব্বাক্। ধৃতরাষ্ট্র লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী সম্পর্কে কথা কহিলেন তখন—যখন দুর্যোধনকে সহাস্যে পাঞ্চালীর উদ্দেশে বাম্ উরু প্রদর্শন করিতে দেখিয়া মহাক্রোধে ভীমসেন সভামধ্যে বজ্রকণ্ঠে তাঁহার উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। ভীমের সেই ভয়াবহ প্রতিজ্ঞার বাণী তীক্ষ্ণ সায়কের মত ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণপটহে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার মোহাবৃতচিত্তে সেই মুহূর্ত্তেই যেন চৈতন্য আনিয়া দিল। তিনি তখন তীক্ষ্ণস্বরে দুর্যোধনকে কহিলেন,—'কোন্ যুক্তিতে তুমি কুরুকুলবধূকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছ?' পরে তিনি সান্ত্বনা বাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন,—কল্যাণি! তুমি আমার বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

দ্রৌপদী পাণ্ডবগণের দাসত্বমুক্তি চাহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যিনি সভামধ্যে এই লাঞ্ছিতা বধূর আর্ত্তনাদেও বিচলিত হন নাই, কুরুবৃদ্ধগণের উদ্দেশে তাঁহার অভিমানক্ষুব্ধ শ্লেষবাক্য শুনিয়াও দুর্ব্বৃত্ত দুঃশাসনকে নিবৃত্ত করেন নাই, ঘটনাচক্রে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে একেবারে কল্পতরু হইয়া উঠিলেন! শুধু দ্রৌপদীর প্রতিই যে তাঁহার প্রসন্নতা তাহা নহে, তিনি প্রসন্ন মনে যুধিষ্ঠিরকে নির্দ্দেশ দিলেন,—তোমার সমস্ত বিজিত ধন সম্পত্তি প্রতিগ্রহ করিয়া স্বরাজ্য শাসন কর। আর বৎস, দুর্যোধনের দুর্ব্বাক্য ও নিষ্ঠুর ব্যবহার নিজ গুণে তুমি ক্ষমা করিও, ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ।

কিন্তু ইহার অব্যবহিত কাল পরেই দুর্যোধন যখন কর্ণ ও শকুনির সহিত ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হইয়া যুক্তি সহকারে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পাণ্ডবদিগকে এইভাবে মুক্তি দিয়া তিনি কৌরবদিগেরই সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। কেন না, পাণ্ডবগণের প্রতি সভায় যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহারা তাহার প্রতিশোধ না লইয়া

কখনই নিরস্ত হইবে না। তখন তিনি পুনরায় বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন, দুর্য্যোধনের এ আশঙ্কা অমূলক নহে, সভাস্থলে ভীমের আস্ফালন তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাহার পর দুর্য্যোধন যখন বলিলেন,—'পাণ্ডবদিগের প্রতিশোধ গ্রহণের পথ একেবারে অবরুদ্ধ করিয়াই আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। এ কার্য্য সফল করিতে হইলে তাহাদিগকে পুনরায় আহ্বানপূর্ব্বক দ্যূত-ক্রীড়ায় নিয়োজিত করিতে হইবে। তবে এবার ক্রীড়ায় এমন কোন পণ থাকিবে না—যাহাতে ক্রোধের কোনরূপ কারণ ঘটিবে। পরাজিত পক্ষ দীর্ঘকালের জন্য বনগমন করিবে —এই পণই এবার নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। শকুনি স্বীয় কৌশল দ্বারা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবেন। ইহাতে উপস্থিত কলহেরও কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, ভবিষ্যতের ভাবনারও কোন কারণ থাকিবে না। যেহেতু, ইতিমধ্যে আমরা রাজ্যে বদ্ধমূল হইয়া বিপুল শক্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইব।' তখন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্র আর কোনরূপ আপত্তি না তুলিয়াই তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন,—'তবে তাহাদিগকে শীঘ্র আনিবার ব্যবস্থা কর।' শুধু এইটুকু বলিয়াই নিরস্ত হইলেন না, পরন্তু নির্দ্দেশ দিলেন যে, যদি তাহারা অধিক দূর গিয়া থাকে, তথাপি ফিরাইয়া আনিবে এবং পাণ্ডবেরা সভামণ্ডপে আসিয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করিবে।

দুর্য্যোধনের প্ররোচনায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পুনরায় দ্যূত-ক্রীড়ার আয়োজন হইতেছে জানিতে পারিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিলেন; এমন কি রাজ্ঞী গান্ধারী দেবী পর্য্যন্ত এই সর্ব্বনাশকর ক্রীড়ায় আপত্তি করিলেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র নিরস্ত হইলেন না, ইঁহাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিলেন।

এ সম্বন্ধে গান্ধারী দেবীর যুক্তিপূর্ণ কথার উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র সংক্ষেপে যে কয়টি কথা দৃঢ়তাসহকারে বলিলেন, তাহাতে পুত্রস্নেহে অভিভূত হইয়াই

তিনি হিতৈষিবর্গের যুক্তি উপেক্ষাপূর্ব্বক দ্বিতীয় দ্যূত-ক্রীড়ার অনুমোদন করেন বলিয়া মনে হয়। গান্ধারী যখন কহিলেন,—'ইহার ফল কুল-ধ্বংসের হেতুভূত হইবে। অতএব আপনি প্রমাদযুক্ত না হইয়া আপনার স্বাভাবিক যে বুদ্ধি তাহাই অবলম্বন করুন।' তখন ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলেন, 'যদি একান্তই কুলধ্বংস হয়, তবে আমি নিরুপায়। কিন্তু প্রাণাধিক পুত্রের বিরুদ্ধাচরণে আমি অক্ষম।'

ত্রয়োদশ বৎসরান্তে প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণের পক্ষ হইতে পাঞ্চাল রাজ পুরোহিত দূতরূপে কৌরবসভায় উপনীত হইয়া পাণ্ডবগণের রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিলে দারুণ বিতর্ক উপস্থিত হয়। বিপক্ষ পক্ষীয় দূতের সমক্ষে সভামধ্যে আত্ম-কলহের এই সঙ্কট সময় ধৃতরাষ্ট্র যেভাবে প্রসঙ্গটির স্রোত ফিরাইয়া দিলেন, তাহাতে তাঁহার কূট-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ সন্ধির সমর্থন করিয়া কহিলেন,—'ইহা আমাদের পক্ষে শুভকর, পাণ্ডবদের হিতকর এবং সমগ্র ক্ষত্রিয়মণ্ডলীর শ্রেয়স্কর। আমি শীঘ্রই সন্ধিস্থাপনের জন্য পাণ্ডবদিগের নিকট দূত পাঠাইতেছি। অতএব আপনি অবিলম্বে তাঁহাদিগের নিকট গমন করুন।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পাঞ্চাল-রাজ-পুরোহিতকে যথোচিত সৎকার-পূর্ব্বক বিদায় করিলেন এবং সঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া সন্ধিস্থাপন সম্পর্কে যে প্রস্তাব পাঠাইলেন, তাহা ত সরলতাব্যঞ্জক নহেই, বরং কূট-রাজনীতিজ্ঞের চক্রান্ত-চালিত একটি অভিনব চাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যথাসময় সঞ্জয় মৎস্যরাজ্যের উপপ্লব্য নগরে উপনীত হইয়া পাণ্ডব-সভায় ধৃতরাষ্ট্রের সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাবটি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কহিলেন,—রাজা ধৃতরাষ্ট্র যে কথা বলিবার নিমিত্ত আমাকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। বৃদ্ধ রাজার সন্ধিস্থাপনের

একান্ত ইচ্ছা, অতএব আপনারা এ সম্বন্ধে উৎসাহী হউন। আপনারা সর্ব্বদাই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া ধর্ম্মকেই প্রাধান্য দিয়াছেন, সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতি ভীষণ লোক-হিংসা নিবারণের উপায় একমাত্র আপনাদেরই আয়ত্তে রহিয়াছে। এ যুদ্ধে এক পক্ষে মহাবল ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ, অপর পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণাদি দুর্জ্জয় মহারথগণ। এ অবস্থায় জয়-পরাজয় উভয়ই সমান শোচনীয় হইবে। অতএব যাহাতে সন্ধিস্থাপন হইতে পারে, তাহার কোন উপায় আপনারাই স্থির করুন।

বলা বাহুল্য যে, ধৃতরাষ্ট্রের নির্দ্দেশানুসারেই সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। স্থিরবুদ্ধি যুধিষ্ঠির ইহাতে অভিভূত বা বিচলিত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপর ইহার মীমাংসা ভার অর্পণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের ন্যায্য দাবীর সমর্থন করিয়া সঞ্জয়কে কহিলেন যে, সমস্তই ধৃতরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করিতেছে। পাণ্ডবগণ মৃদুভাব ধারণেও সম্মত আছেন এবং আবশ্যক হইলে কঠোরতা প্রকাশেও প্রস্তুত আছেন।

কিন্তু জ্যেষ্ঠতাতের কথা যুধিষ্ঠিরকে এরূপ অভিভূত করিয়াছিল যে, তিনি ভাবের আবেগে শেষ পর্য্যন্ত পাঁচখানি মাত্র গ্রামের বিনিময়ে সন্ধি স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র সমীপে নীত হইয়া সসম্ভ্রমে জানাইলেন, আপনি দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ার পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে যাহা দান করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ তাহাই গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। বিস্তারিত আমি কল্য সভায় জ্ঞাপন করিব।

পরদিন সভায় কুরুবংশীয় সকলে সমবেত হইলে সঞ্জয় সর্ব্বসমক্ষে পাণ্ডবগণের সংগৃহীত বিপুল বল শক্তির বর্ণনা করিয়া, যুধিষ্ঠির কথিত

পাঁচখানি জনপদ মাত্র লইয়া সন্ধি স্থাপন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্র ধৃতরাষ্ট্র মনের আবেগে আর কাহাকেও সে সম্পর্কে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষীয় প্রস্তাবের সমর্থনে কহিলেন,—'আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, দৈববলসম্পন্ন পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিলে কৌরবকুলের নিস্তার নাই। সুতরাং ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর প্রভৃতি হিতৈষিগণ ক্রমাগত শান্তি স্থাপনের জন্য যে উপদেশ দিতেছেন, আমি তাহারই অনুসরণ করা বিধেয় মনে করি। আমার একান্ত বাসনা যে, পাণ্ডবদের ধর্মানুগত প্রস্তাব অনুসারে সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক আমরা চিরকল্যাণ লাভ করি।'

ধৃতরাষ্ট্রের এই সমীচীন উক্তি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুর প্রভৃতির আনন্দ বর্দ্ধন করিল বটে, কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে সম্মত হইলেন না। ধৃতরাষ্ট্র আন্তরিকতার সহিত এবার কথাগুলি বলিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধন হয় ত তাঁহার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। কিন্তু পঞ্চগ্রাম মাত্র লইয়াই সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টাকে পাণ্ডবদিগের দুর্ব্বলতার লক্ষণ ভাবিয়া দুর্য্যোধন যখন বলদর্পে যুদ্ধার্থী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন মোহাবিষ্ট পুত্রকে নিবৃত্ত করিতে বৃদ্ধের আকুলি ব্যাকুলি সত্যই মর্ম্মঘাতী! তিনি যখন কাতর স্বরে কহিলেন,—'হে পুত্র! পাপযুদ্ধে লিপ্ত হইলে কুরুকুল ধ্বংস হইবে - অহোরাত্র আমি এই দুশ্চিন্তায় বিহ্বল হইয়া নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছি এবং এই নিমিত্তই আমি সন্ধি স্থাপনে সমুৎসুক।' তখন সভাস্থ অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দুর্য্যোধনের পাষাণ হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইল না। তিনি দৃঢ়তার সহিত নিজের সঙ্কল্পেই স্থির রহিলেন। ইহার পর কর্ণ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করিলেন এবং এই সূত্রে ভীষ্মের সহিত কর্ণের বিরোধ ঘটিল। এই অবস্থায় অতিশয় বিষণ্ণ মনেই ধৃতরাষ্ট্র সভা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিবস পরেই ধৃতরাষ্ট্র সংবাদ পাইলেন যে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব-দূত হইয়া কৌরব-সভায় আসিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া সংবাদটি শুনাইয়া দিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, পরমাত্মীয় ও মাননীয় শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনার উপযুক্ত আয়োজন করা কর্ত্তব্য। নগরীর পথসমূহ সুসজ্জিত ও বিবিধ রত্নালঙ্কৃত বিশ্রাম-গৃহসকল নির্ম্মিত হউক; যাহাতে আমাদের প্রতি তাঁহার প্রীতি জন্মে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করা একান্ত বিধেয়। আমার ইচ্ছা, উৎকৃষ্ট অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত ষোড়শ রথ, অষ্ট মাতঙ্গ, একশত দাসী, পার্ব্বত্য প্রদেশজাত বহুসংখ্যক সুকোমল কম্বল, চীনদেশীয় মৃগচর্ম্ম এবং আমার ও দুর্য্যোধনের ধন-রত্নাদির মধ্যে যাহা কিছু শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত—তাঁহাকে উপঢৌকন প্রদান করিব। আর, দুর্য্যোধন ভিন্ন আমার অন্যান্য পুত্রগণ রথারোহণপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবে।

এই জন্মান্ধ মনীষী কি ভাবে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতেন এবং রাজনীতিক অভিসন্ধির অনুকূলে কিরূপ ব্যবহারকুশলী ছিলেন, এই ঘটনা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার এই অতিভক্তির আসল উদ্দেশ্যটুকু উপলব্ধি করিয়া বিদুর সহাস্যে তাঁহাকে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন ন্যায়ের পক্ষপাতী, ধনরত্নের দ্বারা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবেন না।

দূতরূপী কৃষ্ণকে কৌশলে বন্দী করিবার প্রস্তাব দুর্য্যোধন যখন মন্ত্রণা সভায় উত্থাপন করিলেন, ধৃতরাষ্ট্র সে সময় ব্যাকুল হইয়া পুত্রকে মিনতি করিলেন,—'হে বৎস! কৃষ্ণ আমাদের আত্মীয়, পরম প্রিয়পাত্র এবং দূত। তাঁহার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিলে নিতান্তই অধর্ম্ম হইবে।'

এই অন্যায় ও অনাচারকামী পুত্রের প্রতি স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের

এইরূপ মিনতিবাক্য ভীষ্মদেবকেও ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া দিল। তিনি দৃঢ়স্বরে দুর্য্যোধনের সমক্ষে কহিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র, অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, তোমার এই অনর্থকারী পুত্রকে শাসন না করিয়া তুমি ইহার অনুবর্ত্তন করিতেছ!

কিন্তু তথাপি ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার এই অনর্থকারী পুত্রকে শাসন করা ত দূরের কথা—কোনরূপ রূঢ়বাক্য পর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই। এমন কি, অত কাকুতি-মিনতি করিয়াও তিনি দুর্য্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সম্মান-ভাজন দূতের অমর্য্যাদা নিরস্ত করিতেও সমর্থ হন নাই। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সবিনয়ে নিবেদন করিলেন,—'তোমার বাক্য সঙ্গত, সুখকর ও ন্যায়ানুমোদিত; কিন্তু দেখিতেছ ত, আমি স্বাধীন নহি। যে কার্য্য আমার প্রিয়, তাহা অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব তুমি দুর্য্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা কর।'

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধও যখন ব্যর্থ হইয়া গেল এবং কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে লইয়া দুর্য্যোধন সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সভাস্থ সকলকে লক্ষ্য করিয়া যুক্তি দিলেন,—'দুর্য্যোধনকে শাসন না করিয়া আপনারা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এখন শান্তিরক্ষার একমাত্র উপায় দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করা। আপনারা সমবেত-শক্তিতে তাহাকে বন্ধন করিয়া পাণ্ডবদের হস্তে অর্পণ করুন।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় সভায় তখন চাঞ্চল্য উঠিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র বুঝিলেন, নূতন এক অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব বুদ্ধিবলে এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। বিদুরকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া তৎপরতার সহিত গান্ধারীদেবীকে সভাস্থলে আনাইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, তোমার দুর্ব্বিনীত পুত্র দুর্য্যোধন গুরুজনদের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া অশিষ্টের মত সভা ত্যাগ করিয়াছে এবং তজ্জন্য ভয়ঙ্কর বিপদের উদ্ভব হইতেছে।

অবশ্য, গান্ধারীর আজ্ঞায় দুর্য্যোধন সভায় আসিলেন, সুমন্ত্রণাও শুনিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলই হইল না। তিনি মাতার কথার কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়াই সভা ত্যাগ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বন্ধন করিবার যুক্তি দিয়াছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই বন্ধন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহাতে সভায় তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হইল এবং কোনরূপ নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

শান্তির চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ হইলে উভয় পক্ষই যখন সাংগ্রামিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া কুরুক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় দুর্নীতির পরিণাম চিন্তায় শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। বারণাবতের অনাচার হইতে আরম্ভ করিয়া দ্যূত-ক্রীড়ায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা পর্য্যন্ত একটি একটি করিয়া সমস্ত ঘটনাগুলি তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে যেন সূচীবিদ্ধ করিতে লাগিল। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও উনশত পুত্রের নিধন-সংবাদ সঞ্জয় মুখে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র শোকাভিভূত হইয়া বহু বিলাপ করিয়াছেন, কিন্তু যে দিন সঞ্জয় পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধৃতরাষ্টকে দুর্য্যোধনের মৃত্যু ও উভয় পক্ষের সমগ্র সৈন্যবিনাশের সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন, সেদিন বৃদ্ধ রাজার শোকমথিত দেহ তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল তরুর মত ধরাতলে নিপতিত হইল। তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিদুর ও পুর-মহিলাগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। বহুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ধৃতরাষ্ট কহিলেন,—'হে বিদুর! আমি পুত্রহীন ও অনাথ, তুমি ব্যতীত এক্ষণে আমার আর কেহই নাই।' কিন্তু পরক্ষণেই বিদুরের মুখে যুদ্ধমৃত পরিজনবর্গের পারলৌকিক ক্রিয়াসকল নির্ব্বাহের উপদেশ শুনিবামাত্রই আত্মসংযমপূর্ব্বক স্থবির পুরুষসিংহ উঠিয়া বসিলেন ও গম্ভীর মুখে বিদুরকে কহিলেন,—তুমি যান প্রস্তুত করিবার আদেশ দাও এবং গান্ধারী কুন্তী ও অন্যান্য মহিলাদিগকে আনয়ন কর।'

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের চরণবন্দনা করিলেও, তিনি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে নীরব ও মনে মনে ক্রুদ্ধ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—আপনি স্বয়ং অপরাধ করিয়া অন্যের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন কেন? তখন দুর্য্যোধনকে নিবারণ করেন নাই, সুতরাং এখন আপনার ক্রোধ সম্বরণ করাই উচিত।

শ্রীকৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া উত্তর দিলেন,—

তুমি উচিত কথাই বলিয়াছ। বলবান্ পুত্রস্নেহের প্রভাবে ক্ষণকালের জন্য আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। অতঃপর তিনি পাণ্ডবগণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহাদের শোকে সান্ত্বনা দিলেন।

সমরক্ষেত্রে পতিত প্রিয়জনদিগকে দেখিয়া উভয়পক্ষীয় মহিলাগণ যখন শোকে মুহ্যমান, আর্ত্তস্বরে বিশাল কুরুক্ষেত্রের আকাশ বাতাস স্তম্ভিত; সেই সময় বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করিয়া জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন, এই মহাসমরে নিহত যোদ্ধ্‌গণের মধ্যে যাহারা অনাথ, যাহাদের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত হয় নাই, তাহাদিগকে বিধিপূর্ব্বক সংকার করিতে হইবে। আর শ্বাপদগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা-দিগেরও সদ্গতির জন্য ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াও সম্পন্ন করিতে হইবে।

তাঁহার এই ইচ্ছার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ যথাবিহিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রাধান্য অনুসারে কুরুক্ষেত্রব্যাপী বিরাট অগ্নি সংস্কার চলিল; সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানোচিত বেদধ্বনি এবং রমণীগণের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইল।

বিরাট অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী দেবীকে অগ্রে করিয়া পরিবার-বেষ্টিত যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অবশিষ্ট জীবন স্বার্থচিন্তাশূন্য এক অপূর্ব্ব জীবন—তাহাতে কোন আবিলতা নাই। যুধিষ্ঠির যদিও ভ্রাতৃগণকে বিশেষভাবে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সকলেই অধ্যবসায় সহকারে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ পালন করিবে এবং পৌর ও জানপদবর্গের কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহারই আদেশ অনুসারে সম্পন্ন করিবে। কিন্তু অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের এ সকল ব্যাপারে আর কোন উৎসাহও ছিল না অথবা প্রভুত্ব-লাভের কোন স্পৃহাও তাঁহার চিত্তে দোলায়িত হইত না। ভোগসুখও

তিনি নিষ্ঠাবতী সাধ্বী পত্নীর সহিত বিসর্জন দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই দিবসের শেষভাগে একবার মাত্র আহার করিতেন, তাহাও সামান্য। সুকোমল শয্যা ত্যাগ করিয়া অজিন পরিয়া ভূতলে শয়ন করিতেন। কিন্তু এমন সংগোপনে স্বামী-স্ত্রী এই ভাবে সন্ন্যাস জীবন যাপন করিতেন যে, দীর্ঘ পনের বৎসর কালের মধ্যে কেহ তাহা জানিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু জানিবার সুযোগ করিয়া দিলেন ঘটনাচক্রে ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং ভীমের আচরণে অতিষ্ঠ হইয়া। পাণ্ডবগণের আর সকলেই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা প্রকাশ ও তাঁহাদের সেবায় তৎপর থাকিতেন সত্য, কিন্তু ভীমের ব্যবহার ছিল অতিশয় কঠোর ও অবমাননাকর। একদা ভীমের পরুষ বাক্যে অতিশয় ব্যথিত হইয়া তিনি সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত চিত্তের কৃচ্ছ্রসাধনার কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! তোমার অনুমতি হইলে আমরা এইবার চীর ও বল্কল পরিধান করিয়া অরণ্য আশ্রয় করি।

যুধিষ্ঠির বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। এই সময় ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র এক্ষণে বৃদ্ধ ও পুত্রহীন। এই অবস্থায় সংসারের কষ্টের মধ্যে ইঁহাদিগকে আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। রাজর্ষিগণের প্রদর্শিত পথ এক্ষণে ইঁহাদের অবলম্বনীয়। সুতরাং তুমি ইঁহাদিগকে আর বাধা দিও না।

ইহার পরই ধৃতরাষ্ট্রের সস্ত্রীক বনযাত্রা বা বানপ্রস্থ অবলম্বন। কুন্তীদেবীও ইঁহাদের অনুগমন করিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র মৃত পরিজনবর্গের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পাদন এবং ব্রাহ্মণগণকে বিত্তদান পূর্ব্বক সমবেত জানপদবর্গকে অনুরোধ করিলেন,—তোমাদের সহিত আমাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ, তাহা যেন নিত্য অবিচলিত ভাবে থাকে।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে আমরা যথেষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, বোধ হয়, দুর্য্যোধনের অধিকার সময়েও এরূপ সম্ভব হয় নাই। যাহা হৌক, আমি একে জন্মান্ধ, তদুপরি বৃদ্ধ ও পুত্রপৌত্রবিহীন। এই অবস্থায় বনগমন ভিন্ন আমার শ্রেয়োলাভের আর অন্য উপায় নাই। যুধিষ্ঠির আমাকে বনগমনে অনুমতি দিয়াছেন, এক্ষণে সে সম্বন্ধে তোমরাও অনুমতি প্রদান কর।

বিপুল প্রজাপুঞ্জের প্রাতিনাধরূপে যিনি বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সমগ্র প্রজার মর্ম্মবাণী নিবেদন করিলেন, তাঁহার উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অন্ধ হইলেও কুরুরাজ্যের প্রজাবৃন্দের অন্তর ইনি কি ভাবে অধিকার করিয়াছিলেন এবং এই মহামনীষীর প্রতি তাঁহারা কিরূপ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ভাগীরথীতীরবর্ত্তী তপোবনে অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের তাপস জীবন আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম তিনি ফলমূল আহার করিতেন, তাহার পর জলপান করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। অবশেষে বায়ু মাত্র তাঁহার ভক্ষ্য হয়। এই তপোবনেই একদা যখন দাবাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে এবং তপোবনবাসিগণ জীবনরক্ষার্থ পলায়নপর হন, ধৃতরাষ্ট্র তখন সহধর্ম্মিণী গান্ধারী ও ভ্রাতৃজায়া কুন্তীর সহিত ইন্দ্রিয়রোধপূর্ব্বক যোগাসীন হইলে, তাঁহাদের দেহত্রয় কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হয় এবং পরক্ষণেই দাবাগ্নি অগ্রসর হইয়া ইঁহাদের সকল দুর্গতির অবসান করিয়া দেয়।

রাজর্ষি পাণ্ডু

পাণ্ডু সম্বন্ধে মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—

ভবিষ্যতি সুবিক্রান্তঃ কুমারো দিক্ষু বিশ্রুতঃ।

অর্থাৎ এই বালক যথাকালে অত্যন্ত বিক্রমশালী ও জগদ্বিখ্যাত হইবে।

যৌবনে পদার্পণ করিয়াই পাণ্ডু নিজের বিপুল শৌর্য্যে মহর্ষি ব্যাসের উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন। পাণ্ডু সম্বন্ধে মহাভারতের বর্ণনা এইরূপ—

শান্তনো রাজসিংহস্য ভরতস্য চ ধীমতঃ।

প্রনষ্টঃ কীর্ত্তিজঃ শব্দঃ পাণ্ডুনা পুনরাহৃতঃ॥

অর্থাৎ রাজশ্রেষ্ঠ শান্তনু ও বুদ্ধিমান ভরতের কীর্ত্তি-কাহিনী প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু পাণ্ডু পুনরায় তাহার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডু অসামান্য সৌন্দর্য্যেরও অধিকারী ছিলেন। স্বয়ম্বর সভায় সমবেত রাজন্যবর্গের মধ্যে কুন্তীদেবী ইঁহার কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন। এই বিবাহের ফলে যাদবগণের সহিত কুরুবংশের যোগসূত্র রচিত হইল। কুন্তীদেবীর পিতৃদত্ত নাম পৃথা। ইনি যদু-বংশীয় বাসুদেবের পিতা শূরসেনের কন্যা, সুতরাং সম্পর্কে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা। শূরসেন তাঁহার আত্মীয়স্থানীয় সুহৃদ বৃষ্ণি-বংশীয় নৃপতি কুন্তীভোজের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, প্রথম সন্তানটি তাঁহাকে

প্রদান করিবেন। তদনুসারে রাজকন্যা পৃথাকে কন্যাকালেই তিনি কুন্তীভোজের আলয়ে পাঠাইয়া দেন এবং রাজা কুন্তীভোজ পৃথাকে কন্যার মত আদরে প্রতিপালন করিতে থাকেন। অতঃপর পৃথা পালক-পিতার নামানুসারে কুন্তী নামেই সুপরিচিতা হন।

কুন্তীর মত গুণবতী রাজকন্যা কুরুকুল-বধূরূপে রাজমহিষীর মর্য্যাদা পাইলেও, ভীষ্ম পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন। এক বিবাহের অব্যবহিতকাল পরে পুনরায় আর একটি বিবাহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, কুরুবংশের প্রথানুসারে কোন বিশিষ্ট রাজকন্যাকে সসম্মানে রাজধানীতে আনাইয়া জাঁকজমকের সহিত বিবাহোৎসব সম্পন্ন করাই ছিল ইহার সার্থকতা। কুন্তীর সম্বন্ধে ইহা অনুষ্ঠিত হয় নাই। স্বয়ংবরা কুন্তীদেবী স্বেচ্ছায় পাণ্ডুকে বরণ করায় কন্যার পিতৃভবনেই বিবাহোৎসব হইয়াছিল। অতঃপর মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী মদ্রদেবীকে তাঁহাদিগের কৌলিক নিয়মানুসারে মূল্যবান রথ-গজ-বাজি-বসন-ভূষণাদি শুল্কস্বরূপ প্রদান করিয়া ভীষ্মদেব হস্তিনায় লইয়া আসেন এবং কিয়দ্দিন পরে শুভদিনে মহাসমারোহে পাণ্ডুর সহিত তাঁহার পরিণয়ানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

এই বিবাহের পর নবীন রাজা পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এ সম্পর্কে পাণ্ডুর পরাক্রম ও রণ-পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কুরুবংশের পরমবৈরী দশর্ণাধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত ও অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়া তিনি মগধ আক্রমণ করিলেন। মহাবল দার্ব্ব তখন মগধ সাম্রাজ্যের অধিপতি, ইনিও কৌরবগণের সহিত সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা করিতেন। মগধরাজ দার্ব্বের সহিত কুরুরাজ পাণ্ডুর যে তুমুল সংঘর্ষ ঘটে, তাহাতে দার্ব্ব পরাস্ত ও নিহত হন। মগধ বিজয় করিয়া পাণ্ডু ধাবিত হইলেন বিদেহরাজ্যে। বিদেহরাজও পাণ্ডুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য

হইলেন। অতঃপর কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি রাজ্য বিজয় করিয়া এবং প্রতিদ্বন্দ্বী সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির বিপুল ধন-সম্পদ ও প্রচুর যান-বাহনাদি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে করদরাজের পর্য্যায়ে আনিয়া বিজয়গৌরবে পাণ্ডু রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বিজয়লব্ধ ধন-সম্পদ পাণ্ডু আত্মীয়বর্গের সেবায় নিয়োজিত করিলেন এবং এই বিপুল ধনপ্রভাবে ধৃতরাষ্ট্র কতিপয় বহুব্যয়সাধ্য যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

ইহার অত্যল্পকাল পরেই আমরা দেখিতে পাই যে, পাণ্ডু রাজধানীর বিপুল ঐশ্বর্য্য, মনোরম রাজপ্রাসাদ এবং বিপুল গৌরবে সাম্রাজ্য শাসনের স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া দুই রাজ্ঞী ও কতকগুলি অনুচর সহ দুর্গম হিমালয় প্রদেশ বনভ্রমণ বা বনবিহারের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রাজা পাণ্ডুর এই বনপ্রস্থান বড়ই রহস্যময়। তিনি যে সংসারে বীতরাগ হইয়া প্রব্রজ্যাবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যার জন্য বনবাসী হইয়াছিলেন, বন অঞ্চলে তাঁহার অনুষ্ঠিত আচরণ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হয় না। কেননা, আমরা দেখিতে পাই যে, পাণ্ডু হিমালয়প্রদেশে সর্ব্বদা মৃগয়ায় লিপ্ত ও প্রিয়তমাদের সহিত পরম সুখে কালযাপনে রত থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র রাজধানী হইতে নিয়মিতরূপে উপযুক্ত ও উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা বিবিধ রাজভোগ ও রুচিকর বিলাস দ্রব্যাদি সেই সুদূর পার্ব্বত্যপ্রদেশে পাঠাইয়া দিতেন—যাহাতে কনিষ্ঠের আহারবিহারের কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে। খড়্গ, বাণ ও ধনুর্দ্ধারী, বিচিত্র কবচে আবৃত দেহ পাণ্ডু দুই ভার্য্যা ও অনুচরবৃন্দে পরিবৃত হইয়া যখন বনভ্রমণ করিতেন, বনবাসীরা তাঁহাকে কোন দেবতা বলিয়াই মনে করিত।

রাজ্য ত্যাগ করিয়া পাণ্ডুর এই বনবাস-ব্রত-গ্রহণ এবং জন্মান্ধ

ধৃতরাষ্ট্রের সন্দিগ্ধবর্তী আচরণের আলোচনা সম্পর্কে যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে, দূরদর্শী ও ভ্রাতৃবৎসল পাণ্ডু জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যাসক্তির গুপ্ত তথ্যটুকু জানিতে পারিয়াই জন্মান্ধ জ্যেষ্ঠের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই এইভাবে বনবাসী হইয়াছিলেন; তাহা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া রাজ্যের বিধি অনুসারে রাজ্যাভিষিক্ত হইতে পারেন না; অথচ পাণ্ডু দেখিলেন, জ্যেষ্ঠের অন্তরে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া জ্যেষ্ঠোচিত কর্তৃত্ব পরিচালনার আগ্রহ প্রবল রহিয়াছে; তদ্ভিন্ন ইহাও তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, জন্মান্ধ না হইলে ধৃতরাষ্ট্রই সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন এবং জন্মান্ধতা সত্ত্বেও তিনি প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাজোচিত বহু বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। এ অবস্থায় পাণ্ডুর ন্যায় ভ্রাতৃবৎসল মহাপ্রাণ ব্যক্তি রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াও জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে লজ্জানুভব করিলেন। কিন্তু রাজ্যার্থে এ সম্পর্কে কোনরূপ চাঞ্চল্যের শিহরণ না তুলিয়া এমন কৌশলে তাঁহার অনুপস্থিতকালের জন্য জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া বনভ্রমণের সঙ্কল্পে বাহির হইয়া পড়িলেন যে, কাহারও মনে কোনও রূপ সন্দেহের সঞ্চার হইল না।

এ সময় ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসনস্থ হইয়া বিদুরের পরামর্শানুসারেই রাজকার্য্য সমূহ সম্পন্ন করিতেন। কোষবর্দ্ধন, দান, ভৃত্যগণের পর্য্যবেক্ষণ ও সকলের ভরণপোষণাদির তত্ত্বাবধান ভার বিদুরের উপর ন্যস্ত ছিল এবং ভীষ্মদেব সন্ধি-বিগ্রহ ও আদান-প্রদানাদির কার্য্য সম্পাদন করিতেন। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, বিচক্ষণ পাণ্ডু সাম্রাজ্য পরিচালনা সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াই বেশ জাঁকজমকের সহিত বনপ্রদেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। জনকোলাহলমুখরিত হস্তিনার ন্যায় মহাসমৃদ্ধিযুক্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া সুদূর অরণ্য অঞ্চলে গিয়াও

প্রিয়তমা ভার্য্যাদ্বয়ের সাহচর্য্যে তিনি পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে নিয়তির নির্ব্বন্ধে একদিনের একটি মর্ম্মান্তিক ঘটনায় তাঁহার সকল আনন্দের অবসান হইয়া গেল।

একদা মহাবন মধ্যে মৃগয়াকালে মিথুনরত এক মৃগ-দম্পতি পাণ্ডুর নেত্রপথবর্ত্তী হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের উদ্দেশে শর নিক্ষেপ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে মৃগ-দম্পতি তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরে বিদ্ধ ও নিহত হইল। মহাভারতীয় কথায় প্রকাশ যে, কিমিন্দম নামে এক মুনি লোকলজ্জাভয়ে মহাবনে আসিয়া হরিণের রূপ ধারণ করিয়া হরিণীরূপিণী ভার্য্যার সহিত রমণ করিতেছিলেন। পাণ্ডু-নিক্ষিপ্ত বজ্রসম শরে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে পাণ্ডুকে তিনি অভিশাপ দিলেন, তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অনুচিত সময়ে বধ করিলে, আমার অভিশাপে, তোমারও এইরূপ অনুচিত সময়ে মৃত্যু হইবে।

এই মর্ম্মান্তিক ঘটনাটির অলৌকিক অংশ বর্জ্জন করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মহাবনমধ্যে মৃগীর সহিত ক্রীড়ারত মৃগযূথপতি পাণ্ডুর শরাঘাতে ভূপতিত হইলে, তাহার মৃগভার্য্যাগণ প্রাণভয়ে পলায়ন না করিয়া মৃত্যুপথযাত্রী তাহাদের প্রিয়তম দয়িতকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক আর্ত্তস্বরে বিলাপ করিতে থাকে। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া মৃগয়া সম্পর্কে কত মৃগকেই পাণ্ডু নিহত করিয়াছেন, কিন্তু এরূপ হৃদয়ভেদী দৃশ্য তিনি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করিলেন। প্রিয়শোকাতুরা মৃগীদের ব্যাকুল ক্রন্দনে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল, তিনিও একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তাঁহার মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল—হিংসাবুদ্ধির প্রভাবে তিনি যে অনাচার করিয়াছেন, রাজা হইলেও তাহার শাস্তি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে; হয়ত এই মৃগের মতই পত্নীসংসর্গকালে তাঁহাকেও কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে।

সঙ্গে সঙ্গেই পাণ্ডুর মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল এবং এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সেই দণ্ডেই তিনি পার্থিব যাবতীয় ভোগবাসনা বর্জ্জন পূর্ব্বক প্রব্রজ্যাগ্রহণে বদ্ধপরিকর হইলেন।

পাণ্ডু সঙ্কল্প করিলেন,—অতঃপর তিনি প্রিয় ও অপ্রিয় সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন, নিজের নিন্দা ও প্রশংসাকে সমান ভাবিবেন, সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকিবেন, সমস্ত প্রাণীর হিত সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, অন্যথায় উপবাসী থাকিবেন এবং মুক্তির পথ আশ্রয় করিয়া দেহত্যাগ করিবেন।

দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রীকে কহিলেন,—তোমরা হস্তিনায় ফিরিয়া যাও এবং পুরবাসীদিগকে বলিবে যে পাণ্ডু বনমধ্যে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছে।

কুন্তী ও মাদ্রী দুই জনে তখন পরামর্শ করিয়া স্বামীকে যুক্তি দিলেন, —আমরা আপনার ধর্ম্মপত্নী, সুতরাং আপনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া কঠোর তপস্যার জন্য অন্য আশ্রয়ও গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা পার্থিব সকল সুখ ত্যাগ করিয়া আপনার সহিত তপস্যা করিব।

কথাটা পাণ্ডুর মনে ভাল লাগিল। তিনি কহিলেন,—'বেশ, ইহা যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমার সহিত তোমাদিগকে আর্য্য বেদব্যাস নির্দ্দিষ্ট প্রব্রজ্যার শাশ্বত পদ্ধতিগুলির অনুসরণ করিতে হইবে।' অতঃপর বৃত্তিগুলির একটা তালিকাও তিনি শুনাইয়া দিলেন। যথা শীত, বায়ু ও রৌদ্রের প্রভাব সহ্য করা, ক্ষুধা ও পিপাসাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা, কঠোর তপস্যাদ্বারা শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলা, নির্জ্জনে শ্রীভগবানের ধ্যান এবং আতপ চাউলের অন্ন ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ, বসনভূষণ ছাড়িয়া মৃগচর্ম্ম পরিধান ইত্যাদি। নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের মণিমুক্তাখচিত বসনভূষণ, পত্নীদ্বয়ের মহামূল্য রত্নালঙ্কারসমূহ,

উৎকৃষ্ট বাহনাদি, অস্ত্র কবচ প্রভৃতি বনবাসীদিগকে বিতরণ করিলেন এবং ভৃত্যবর্গকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত নাগপর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া হিমালয়ের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী দুর্গম গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। তথায় সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডু সাদরে গৃহীত হন। গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে তিনি অত্যুচ্চ শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় দীর্ঘকাল যাবৎ পাপনাশক তপস্যান্তে তিনি ব্রহ্মর্ষির তুল্য শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন।

এই সময় শতশৃঙ্গপর্ব্বত নিবাসী ব্রহ্মর্ষিদিগকে সশরীরে ব্রহ্মলোকে এক সম্মিলনে যোগদান করিতে যাইতে দেখিয়া পাণ্ডুও তাঁহাদিগের সঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মর্ষিগণ তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিলেন যে, সশরীরে ব্রহ্মলোকে যাইবার অধিকার এখনও তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে এ সঙ্কল্প তাঁহার পরিত্যাগ করাই উচিত।

পাণ্ডু উক্ত নিষেধ বাক্যের অর্থ এই ভাবে গ্রহণ করিলেন যে, নিঃসন্তানগণের পক্ষে স্বর্গদ্বার রুদ্ধ বলিয়াই ব্রহ্মর্ষিরা তাঁহাকে নিবারিত করিলেন। তিনি তখন আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, নিঃসন্তান বলিয়া আমার পক্ষে স্বর্গদ্বার রুদ্ধ, অতএব আমার পিতৃগণেরও পতন াবী।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুর আক্ষেপবাণী শুনিয়া কহিলেন,—আমরা দিব্যদৃষ্টিতে আপনার দেবতুল্য সর্ব্বকল্যাণভাজন নিষ্পাপ পুত্র দেখিতে পাইতেছি। আমরা যাহা দেখিলাম, আপনি এখানে থাকিয়া সেই ফললাভের জন্য সচেষ্ট হউন: অবশ্যই আপনি পুত্রলাভ করিবেন।

অতঃপর পুত্রলাভই পাণ্ডুর সাধক জীবনের ব্রত হইল এবং তাহারই ফলে দেবতার অনুগ্রহে অলৌকিক উপায়ে পঞ্চপাণ্ডব জন্ম গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু মহর্ষিকল্প হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী পাণ্ডু কুসুমায়ুধের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এবং ইহাতেই তাঁহার পতন ঘটিল। বসন্তকালের এক মনোহর ঊষায় পাণ্ডু মাদ্রীর সহিত বনভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময় তিনি মৃগ-ঋষির অভিশাপ বিস্মৃত হইয়া মাদ্রীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। অভিশাপের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও নিদারুণ আত্মগ্লানিকে পাণ্ডুর এই শোচনীয় অপমৃত্যুর কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ক্ষণিকের মোহে এই অনুচিত অনাচারে প্রবৃত্ত হইবামাত্রই তাঁহার ভার্য্যা মাদ্রীদেবী তাঁহাকে মৃগপতিবধকালীন প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুর চৈতন্য হইল এবং নিদারুণ আত্মগ্লানি ও অনুশোচনার প্রখর উত্তাপ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এমনই জ্বালা ধরাইয়া দিল যে, সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

পাণ্ডু এই ভাবে আত্মাহুতি দিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন যে, মনকে সংযত করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। মানবতার দিক্ দিয়া পাণ্ডুর এই আত্মদান সত্যই অতুলনীয়।

বিদুর

দাসীগর্ভজাত হইয়াও একই পিতা মহর্ষি ব্যাসের ঔরস পুত্র বলিয়া বিদুর জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সহিত সমান আদরে পালিত ও যথাবিহিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মহাত্মা বিদুর সম্বন্ধে মহাভারতের মূল কথা এইরূপ—

ধর্ম্মো বিদুররূপেণ শূদ্রযোনাবজায়ত।
ধর্ম্মে চার্থে চ কুশলো লোভক্রোধবিবর্জ্জিতঃ।
দীর্ঘদর্শী শমপরঃ কুরূণাঞ্চ হিতে রতঃ॥ আ পঃ ১০৮।১৯

অর্থাৎ—ধর্ম্ম বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে কুশল, ক্রোধলোভ-বিবর্জ্জিত, শমপরায়ণ, পরিণামদর্শী ও কুরুবংশের হিতসাধনে তৎপর ছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহের পর ভীষ্মদেব দেবক নামক রাজার শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভোৎপন্না পরমা সুন্দরী কন্যা পারশবীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন পূর্ব্বক মহাসমারোহে বিদুরের সহিত তাহার বিবাহ দেন।

বিদুরের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু, শান্তিপ্রিয়, একান্ত রক্ষণশীল এবং সকল বিষয়েই দৈবের উপর অতিশয় নির্ভরশীল ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধনের জন্মগ্রহণকালে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া বিদুর এরূপ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে নবজাত পুত্রকে বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

বলা বাহুল্য, ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের এই পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই

এবং ভীষ্মদেবও দুর্নিমিত্তের জন্য নবজাত পুত্রকে দায়ী করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের এমন নিষ্ঠুর নির্দ্দেশের সমর্থন করিতে পারেন নাই।

ফলতঃ দুর্নিমিত্তসূচক সময়ে জাত দুর্য্যোধনের সম্বন্ধে বিদুরের মনে এই যে একটা বিরুদ্ধ ধারণার অঙ্কুরোৎপত্তি হইল, পরে দুর্য্যোধনের আচরণ সম্পর্কে তাহা ক্রমশঃই দৃঢ় ও বদ্ধমূল হইয়াছিল।

পাণ্ডুর মৃত্যুর পর পঞ্চপাণ্ডব কুন্তীর সহিত হস্তিনায় উপস্থিত হইলে বিদুর তাঁহাদেরই বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। প্রথমতঃ তাঁহারা পিতৃহীন; দ্বিতীয়তঃ, দুর্য্যোধনকে বিদুর শৈশব হইতেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। পঞ্চ পাণ্ডব, বিশেষতঃ ভীমের প্রতি দুর্য্যোধন যে অতিশয় বিদ্বেষপরায়ণ, বিদুর তাহা নানা সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য সদাসর্ব্বদাই তিনি কুন্তী ও পাণ্ডবদিগকে দুর্য্যোধন সম্বন্ধে সতর্ক থাকিতে পরামর্শ দিতেন।

দুর্য্যোধনের কৌশলে ভীম যে দিন ক্রীড়াক্ষেত্রে বিষাক্ত মিষ্টান্ন ভোজনে প্রসুপ্ত হইয়া নদীজলে নিক্ষিপ্ত হন এবং ক্রীড়ান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত পুত্রগণের মধ্যে ভীমকে না দেখিয়া কুন্তীদেবী বিদুরকে আহ্বান করিয়া বলেন - 'ভীমকে না দেখিয়া তাহার অনিষ্টাশঙ্কায় আমি অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছি। বহুদিন হইতেই আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীমের প্রতি অতিশয় বিদ্বেষপরায়ণ। এখন আমি কি করিব বলুন।' বিদুর তখন অতি সন্তর্পণে কুন্তীদেবীকে প্রবোধ দিলেন যে,—এ আশঙ্কার কথা কাহারও নিকট যেন প্রকাশ করা না হয়। তবে ভীমসেন সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ নাই, সে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবে।

ইহাতে উপলব্ধি হয় যে বিদুর দুর্য্যোধনকে কিরূপ সন্দেহ ও আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভীমের নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা লইয়া তিনি গোলযোগ তুলিতেও সাহস করেন নাই।

ধার্ত্তরাষ্ট্রদের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে বিদুরই পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বদা সচেতন করিয়া রাখিতেন এবং তাঁহার পরামর্শে পাণ্ডবগণ তাঁহাদের মনোভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

কিন্তু দুর্য্যোধনকে বিদুর যেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন, দুর্য্যোধনও তেমনই তাঁহার অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডবদের পক্ষপাতী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অতঃপর সমাতৃক পঞ্চপাণ্ডব যখন দুর্য্যোধনের কৌশলে বারণাবতে যাত্রা করেন, বিদুর তখন দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক করিবার জন্য ম্লেচ্ছ ভাষায় ইঙ্গিতে যে উপদেশ দেন, তাহাই বারাণসীতে জতুগৃহদাহ হইতে তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা করে। বিদুরের সেই ইঙ্গিত বাক্যটি এইরূপ—

যো জানাতি পরপ্রাজ্ঞং নীতিশাস্ত্রানুসারিণীম্।
বিজ্ঞায়েহ তথা কুর্য্যাদাপদং নিস্তরেদ্ যথা ॥
অলোহং নিশিতং শস্ত্রং শরীরপরিকর্ত্তনম্।
যো বেত্তি ন তু তং ঘ্নন্তি প্রতিঘাতবিদং দ্বিষঃ ॥
কক্ষঘ্নঃ শিশিরঘ্নশ্চ মহাকক্ষে বিলৌকসঃ।
ন দহেদিতি চাত্মানং যো রক্ষতি স জীবতি ॥
নাচক্ষুর্বেত্তি পন্থানং নাচক্ষুর্বিন্দতে দিশঃ।
নাধৃতির্বুদ্ধিমাপ্নোতি বুধ্যস্বৈবং প্রবোধিতঃ ॥
অনাপ্তৈর্দত্তমাদত্তে নরঃ শস্ত্রমলোহজম্।
শ্বাবিচ্ছরণমাসাদ্য প্রমুচ্যেত হুতাশনাৎ ॥
চরণ্ মার্গান্ বিজানাতি নক্ষত্রৈর্বিন্দতে দিশঃ।
আত্মনা চাত্মনঃ পঞ্চ পীড়য়ন্নানুপীড্যতে ॥ আ-প,১৪৫।২১-২৬

অর্থাৎ—বিজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদাই আপদ্ হইতে নিস্তারের উপায় উদ্ভাবন

করেন। শক্রদিগের কুমন্ত্রণারূপ-অস্ত্র লৌহনির্ম্মিত না হইলেও শরীর ছেদন করে। তৃণ মধ্যে বিবর খনন করিয়া বাস করিলে তৃণদাহক অগ্নি দাহ করিতে সমর্থ হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় যাহার অধীন, সেই জয়ী হয়। পথ না চিনিলে নক্ষত্রদ্বারা দিঙ্‌নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।

যে ভাষায় বিদুর এই ইঙ্গিত বাক্য কহিলেন,—যুধিষ্ঠির তাহা উপলব্ধি করিয়া সেই ভাষাতেই উত্তর দিলেন যে, তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছেন।

বিদুর শুধু ইঁহাদিগকে ইঙ্গিত বাক্যে সতর্ক করিয়াই নিরস্ত হন নাই, পাণ্ডবদিগের সহায়তাকল্পে তাঁহার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তিই তাঁহাকে দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধির বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিল। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণ যখন নদীতীরে উপনীত হইয়া পার হইবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় বিদুরের উক্ত অনুচর নৌকা লইয়া দেখা দিল এবং বিদুরের সাঙ্কেতিক বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক পাণ্ডবদের প্রীতিতি জন্মাইয়া তাঁহাদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া চলিল। ইহাতে মনে হয় যে, বিদুর নিয়োজিত গুপ্তচর কৌরবদিগের মধ্যে থাকিয়া সুকৌশলে তাঁহাদিগের অভিসন্ধিসমূহ সংগ্রহ করিতে অভ্যস্ত ছিল।

এদিকে হস্তিনাপুরে পাণ্ডবদের শোকে সকলেই যখন অধীর, ধৃতরাষ্ট্র পর্য্যন্ত পুনরায় অনুজ পাণ্ডুর শোক নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন, বিদুরও সে সময় তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া কৃত্রিম শোক প্রকাশের অভিনয় না করিয়া পারিলেন না।

কিছুকাল পরে এই বিদুরই ধৃতরাষ্ট্রকে প্রথম সংবাদ দিলেন যে, পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন, এবং লক্ষ ভেদ করিয়া পাঞ্চালীকে লাভ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র এ সংবাদে মৌখিক উল্লাস প্রকাশ করিয়া যদিও

বিদুরকে বলিয়াছিলেন,—'এ সংবাদ শুনিয়া আমি প্রীত হইয়াছি।' কিন্তু দূর ভবিষ্যতে সঞ্জয়ের সমক্ষে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে যে দীর্ঘ বিলাপ করিয়াছিলেন তাহাতে এ সম্পর্কে তাঁহার মর্ম্মবাণী সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যথা—

যদাশ্রৌষং দ্রৌপদীং রঙ্গমধ্যে লক্ষং ভিত্ত্বা নির্জ্জিতামর্জ্জুনেন।

শূরান্ পাঞ্চালান্ পাণ্ডবেয়াংশ্চ যুক্তাংস্তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

অর্থাৎ যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন রঙ্গমধ্যে লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লাভ করায়, মহাবল পাঞ্চাল ও পাণ্ডবের মিলন হইয়াছে, হে সঞ্জয়! আমি তখনই আর জয়ের আশা করি নাই।

অতঃপর পাণ্ডবদিগের রাজ্যার্দ্ধ প্রদান সম্পর্কে আলোচনা সভায় বিদুর দৃঢ়তার সহিত ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছিলেন,—বান্ধবগণ উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে তাহা শূন্য বাক্যজালে পর্য্যবসিত হয়। কুরুপ্রধান ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ যে উপদেশ দিলেন, কর্ণ তাহা হিতকর বিবেচনা করিলেন না। এক্ষণে আপনিই বিবেচনা করুন, কে অধিক বুদ্ধিমান, কে প্রকৃত মিত্র, কাহার যুক্তি গ্রহণযোগ্য। পাণ্ডবগণ এখন পাঞ্চালগণের সহিত মিলিত এবং যাদবগণ তাঁহাদের সহায়—এইসঙ্গে ইহাও বিবেচ্য।

ইহার পরই ধৃতরাষ্ট্র—'তুমি যাহা বলিলে তাহা অভ্রান্ত' বলিয়া তাঁহার উপরেই কুন্তী ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণকে সৎকার পূর্ব্বক হস্তিনায় আনয়ন করিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

অক্ষক্রীড়াকে অনর্থজনক জানিয়াও ধৃতরাষ্ট্র যখন পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে সম্মতি দেন, তখন বিদুর এই বহু দোষকর ক্রীড়া নিবারণ করিবার জন্য বহু চেষ্টাই করিয়াছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সে সময় ইহা দৈবপ্রসূত বলিয়া বিদুরের মুখ বন্ধ করিয়া দেন এবং বিদুরকেই

ইন্দ্রপ্রস্থে গমনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে ক্রীড়ার্থ আমন্ত্রণ জানাইতে বাধ্য করেন।

বিদুর এখানে রাজাজ্ঞা বহন করিয়া দূতরূপেই যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নিমন্ত্রণ জানাইয়া, তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র যে ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠিরকে ক্রীড়ার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, একথাও তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন এবং এ সম্বন্ধে যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয় তাহাই করিতে বলেন। রাজাজ্ঞায় তিনি নিমন্ত্রণ করিতে উপস্থিত, এ অবস্থায় প্রত্যক্ষ ভাবে যুধিষ্ঠিরকে নিবারণ করা যে অযৌক্তিক, ইহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি ব্যক্তিগতভাবে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় যোগদান করিতে নিষেধ না করিয়া তাঁহাকেই বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

কিন্তু এই ক্রীড়া ব্যবস্থায় তিনি যে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত অপ্রসন্নভাবেই দ্যূত-ক্রীড়া-সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ক্রীড়াসূত্রে পরাজয়-জনিত লজ্জায় উত্তেজিত হইয়া যুধিষ্ঠির যখন উত্তরোত্তর পণবৃদ্ধি করিতে থাকেন এবং একে একে ইন্দ্রপ্রস্থের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেন, সেই সময় আমরা দেখিতে পাই যে, সভামধ্যে স্তব্ধ বিদুরই প্রথম মৌনভঙ্গ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন,—মুমূর্ষু ব্যক্তির যেরূপ ঔষধ সেবনে প্রবৃত্তি হয় না, আমার উপদেশ বাক্য সম্ভবতঃ সেইরূপ আপনারও প্রীতিকর হইবে না; তথাপি আমি আপনাকে স্মরণ করিয়া দিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না যে, এই পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই ঘোর দুর্নিমিত্ত সকল দেখা দিলে আমরা তখন ইহাকে আমাদের বিনাশের নিদানভূত বলিয়া ভাবিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি কুল রক্ষা

করিতে চান, এখনও এই কুলনাশক পুত্রকে ত্যাগ করুন এবং পাপমতি শকুনিকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে বলুন।

বিদুরের কথার উত্তরে বজ্রকণ্ঠে দুর্য্যোধন তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—তুমি পক্ষপাতের অপরাধে পাপী। ধর্ম্মের ভাণ করিয়া তুমি আমাদিগকে যখন তখন তিরস্কার করিয়া নিজেকে কর্ত্তা মনে করিয়া উপদেশ দিবার স্পর্দ্ধা করিও না। সহনশীলতারও সীমা আছে জানিও।

ধৃতরাষ্ট্র এ সম্বন্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করিলেন না। বিদুরও এ সম্পর্কে আর প্রতিবাদ করিলেন না। অতঃপর পূর্ণোদ্যমেই ক্রীড়া চলিল এবং তাহার পরিণাম ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়া দ্রৌপদীকেও যখন সভাস্থলে উপনীত করিল তখন পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির একা পণ রাখিতে পারেন কি না এই প্রশ্ন সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র, বিকর্ণ 'বিচার সূত্রে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, এইরূপ উত্তর প্রদান করিলে, বিকর্ণের কথার সমর্থনে বিদুরও দৃঢ়স্বরে কহিলেন—'দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার ক্ষমতা যুধিষ্ঠিরের ছিল না, সুতরাং অবিলম্বে এবিষয়ে উচিত বিধান প্রয়োজন।' ইহার পরেই এই ভয়াবহ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং ধৃতরাষ্ট্র অতিমাত্র বিচলিত হইয়া দ্রৌপদীকে আহ্বান করিয়া ও বরপ্রদানে পাণ্ডবগণের দাসত্ব মোচন করিয়া দেন।

ইহার পর দ্বিতীয় বার দ্যূত ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হইলে বিদুর পূর্ব্বাপমান বিস্মৃত হইয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিয়াছিলেন। এই ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পাণ্ডবগণ যখন বনবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন, বিদুর তখন অগ্রবর্ত্তী হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—তোমাদের মাতার বন গমন কিছুতেই উচিত হয় না। তিনি আমার আলয়ে বাস করুন।

পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনি এই বলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—যে ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাবে তোমরা এই সমস্ত

লাঞ্ছনা ও অবমাননা উপেক্ষা করিলে, তাহা তোমাদের চিরকাল যেন অক্ষুন্ন থাকে এবং তাহারই বলে তোমরা নির্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও।

পাণ্ডবগণের প্রস্থানান্তে বিদুরের আগমন অবগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র লজ্জাকম্পিত কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন,--হে বিদুর! যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তুমি আমাকে সদুপদেশ দাও।

বিদুর কহিলেন, —মহারাজ! আমি যেমন চিরকালই বলিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। এখন আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে, হয় আপনার কুলনাশক পুত্রকে পরিত্যাগ করুন, নতুবা পুত্রকৃত পাপক্ষালনার্থ পাণ্ডবদের পৈতৃক রাজ্য তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করুন।

পুত্র সম্বন্ধে এইরূপ কঠোর বাক্য শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় রুষ্ট হইয়া বিদুরকে কহিলেন, --আমি বুঝিতেছি, কোন প্রকারে পাণ্ডবদিগকে রাজ্যপ্রদান করাই তোমার অভিপ্রায়। দেখিতেছি, তাহাদের হিত-সাধনই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমার হিতাহিতে তোমার অণুমাত্র যত্ন নাই। বুঝিলাম যে, বিশ্বাসঘাতককে বহু সম্মানদ্বারাও স্বপক্ষে স্থিরভাবে আবদ্ধ রাখা যায় না। সুতরাং তুমি এই স্থানেই থাক, বা অন্যত্র গমন কর, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই।

বিদুর স্তব্ধ হইয়াই জ্যেষ্ঠের এই তিরস্কার শুনিলেন। এমন রূঢ় বাক্য ইহার পূর্ব্বে কোন দিন তিনি এই বৃদ্ধের নিকট শ্রবণ করেন নাই। তিনি বুঝিলেন, ধর্ম্মানুগত নিষ্পত্তির আর কোন আশাই নাই। এদিকে পাণ্ডবগণের বিচ্ছেদ বেদনা তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিতেছিল। জ্যেষ্ঠের তিরস্কার তাহাতে বিষের প্রলেপ দিল। তিনিও অতঃপর রাজধানী ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের উদ্দেশে বনাভিমুখে গমন করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই ধৃতরাষ্ট্রের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ

সঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আমি মোহবশত বিনা অপরাধে বিদুরকে অপমান করিয়াছি, তুমি শীঘ্র গিয়া তাহাকে আনয়ন কর।

সঞ্জয়ের সহিত যথাসময় বিদুর ভ্রাতৃ সমক্ষে উপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে ক্রোড়ে টানিয়া ভ্রাতৃস্নেহে গদগদ হইয়া কহিলেন,—তোমাকে পাইয়া আমি জীবন পাইলাম। তোমার নিমিত্ত আমি বিনিদ্রভাবে সমস্তরাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।

বিদুর কহিলেন,—আপনি আমার পরম গুরু। আপনার পুত্র ও পাণ্ডুর পুত্র আমার নিকট সমান। তবে পাণ্ডবগণ পিতৃহীন বলিয়া তাহাদের প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকি।

ত্রয়োদশ বর্ষান্তে প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিলে তাঁহাদিগের রাজ্য প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে যখন কৌরবসভায় তুমুল আলোচনা চলিতে থাকে এবং দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির প্ররোচনায় সমরানল প্রজ্বলিত করিতে বদ্ধপরিকর হন, সে সময় ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া পরামর্শপ্রার্থী হইলে বিদুর তাঁহাকে বিবিধ উপাখ্যান ও ধর্ম্মকথার সহিত যে সদুপদেশ দেন, তাহাতে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়। সেই উপদেশ প্রসঙ্গে বিদুর বলিলেন,—

তব পুত্রশতঞ্চৈব, কর্ণঃ পঞ্চ চ পাণ্ডবাঃ।
পৃথিবীমনুশাসেয়ুরখিলাং সাগরাম্বরাম্ ॥
ধার্ত্তরাষ্ট্রা বনং রাজন্ ব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডুসুতামতাঃ।
মা বনং ছিন্ধি সব্যাঘ্রং মা ব্যাঘ্রানী নশন্ বনাং ॥
ন স্যাং বনমৃতে ব্যাঘ্রান্ ব্যাঘ্রা ন স্যুর্খতে বনম।
বনং হি রক্ষতে ব্যাঘ্রৈর্ব্ব্যাঘ্রান্ রক্ষতি কাননম্ ॥

উ-প ৩।।৪৩-৪৬

অর্থাৎ—আপনার শতপুত্র, কর্ণ ও পঞ্চপাণ্ডব, ইহাঁরা সাগরম্বরা অখিল

বসুন্ধরা শাসন করিতে সমর্থ। আপনার পুত্রগণ বনস্বরূপ, এবং পাণ্ডু-পুত্রগণ সেই বনের ব্যাঘ্র বিশেষ। অতএব ব্যাঘ্রযুক্ত বনের উচ্ছেদ করিবেন না এবং ব্যাঘ্রগণকেও বন হইতে পরিভ্রষ্ট করা উচিত নয়। ব্যাঘ্রগণ ব্যতীত বন থাকিতে পারে না, কেন না, ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক বন রক্ষিত হয় এবং বন ব্যাঘ্রদিগকে রক্ষা করে।

কুরুপাণ্ডবের মিলন সম্পর্কে বিদুরের ব্যাঘ্রের উপমাসূচক এই উপদেশ কি মনোজ্ঞ ও মর্ম্মস্পর্শী!

ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রালোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে, বিদুর জ্যেষ্ঠের অন্তরটি যেন গ্রন্থের মতই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসিতেছেন জ্ঞাত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার জন্য দুর্লভ উপহার সামগ্রী প্রেরণের প্রস্তাব করিলে বিদুর এ সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠের অভিসন্ধি উপলব্ধি করিয়া এই বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন—আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি যে, আপনি মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু আপনার এ চেষ্টা নিতান্তই ব্যর্থ হইবে। ধন রত্ন বা সমাদর দ্বারা আপনি তাঁহাকে পাণ্ডব হইতে পৃথক করিতে পারিবেন না।

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ এবং স্বল্পক্ষণের জন্য তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেও বিদুরের ভবনেই আহার ও বিশ্রাম করিয়াছিলেন। বিদুর ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সৎকার পূর্ব্বক নিবেদন করেন,—হে কেশব! তোমাকে পাইয়া যে রূপ প্রীত হইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। তোমার মুখে পাণ্ডবগণের সংবাদ আদ্যোপান্ত শুনিতে একান্ত উৎসুক আছি।

শ্রীকৃষ্ণ বিদুরকে পাণ্ডবদিগের বিবরণ শুনাইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে

কৌরব সভায় উপনীত হন। তথায় দুর্য্যোধন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলে তিনি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দেন যে, দূতগণ কার্য্যসমাধান্তে পূজা ও ভোজন গ্রহণ করেন। সুতরাং সিদ্ধকাম হইলে তিনিও ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন।

কথাটা দুর্য্যোধনের ভাল লাগে নাই। তিনি একটু বিরক্ত ভাবেই কহিলেন,—'তুমি কৃতকার্য্য হও আর নাই হও, আমরা সাধ্যমত তোমার পূজা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। কিন্তু আমাদের সবিনয় অনুরোধ উপেক্ষা করিবার কারণ বুঝিলাম না।' শ্রীকৃষ্ণ তখন সহাস্যে দুর্য্যোধনের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'আমাদের পরম সুহৃদ্ বিদুর আমাকে তাঁহার আলয়ে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন ; সেখানেই ভোজন করা আমি শ্রেয়ঃ মনে করিতেছি।' বিদুরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই অসীম অনুগ্রহের পরিচয় পাইয়া সভাশুদ্ধ সকলেই চমৎকৃত হন।

শ্রীকৃষ্ণ কথামতই কার্য্য করিলেন। সে দিন সভায় কৌরবগণের সম্বর্দ্ধনা গ্রহণের পর তিনি বিদুরের আলয়ে গমন করিয়া সেইখানেই প্রীতমনে ভোজন সমাপন এবং বিদুর ভবনেই রাত্রি যাপন করিলেন।

শান্তিস্থাপনে সর্ব্বতোভাবে অকৃতকার্য্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরাট রাজ্যের উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবগণের নিকট প্রত্যাগমন করিলে বিদুরও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধান্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসু যখন যুধিষ্ঠিরের সম্মতি অনুসারে কৌরব শিবির হইতে রাজমহিলাগণকে লইয়া হস্তিনার প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, বিদুর তখন তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন,—বৎস ! তুমি কৌরব-বধূগণকে প্রাসাদে আনিয়া সময়োচিত কার্য্য ও কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। তুমিই এক্ষণে অব্যবস্থিতচিত্ত অদূরদর্শী রাজ্যলোলুপ হতভাগ্য অন্ধনৃপতির একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইলে।

ইহার পর আমরা শুনিতে পাই—শত পুত্র শোকে মুহ্যমান অন্ধ নৃপতির মর্ম্মভেদী বিলাপ এবং সেই সঙ্গে জ্যেষ্ঠের আর্ত্ত কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বিদুরের আর্ত্তনাদ।

এই সময় শোকার্ত্ত জ্যেষ্ঠের প্রতি বিদুরের সান্ত্বনাবাণীও কি মর্ম্মস্পর্শী! বৃদ্ধের পূর্ব্বানুষ্ঠিত অন্যায়াচরণের জন্য কোন অনুযোগ বিদুরের কথায় নাই, সমরে নিহত পুত্রগণের জন্য শোকসন্তপ্ত ক্ষত্রিয় পিতাকে বিদুর সান্ত্বনা দিলেন, কেন আপনি বিচলিত হইতেছেন আর্য্য? কিছুই ত চিরস্থায়ী নহে। পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ মিলনের অন্ত এবং মৃত্যু জীবনের অন্ত। লোকে যুদ্ধ না করিয়াও কালগ্রাসে পতিত হয়, আবার অনেকে যুদ্ধ না করিয়াও জীবিত থাকে। কাল উপস্থিত হইলে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না, তবে ক্ষত্রিয়গন কি নিমিত্ত স্বধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইবেন? কিন্তু মৃতের জন্য শোকের কি প্রয়োজন! বিশেষতঃ তাঁহারা যখন সকলেই সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছেন!

বিদুরের এই সময়োচিত সান্ত্বনা ধৃতরাষ্ট্রকে আত্মসংযম করিবার সামর্থ্য দিল।

ইহার পর আমরা দেখিতে পাই, এই স্বার্থশূন্য ভ্রাতৃবৎসল সর্ব্বত্যাগী বিদুর ছায়ার ন্যায় হৃতসর্ব্বস্ব ভ্রাতার পার্শ্বচারী। পঞ্চদশ বৎসর হস্তিনায় অবস্থিতির পর ধৃতরাষ্ট্র যেদিন সপত্নীক প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বন গমন করিলেন এবং দেবী কুন্তীও তাঁহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেন, তখন বিদুরকেও তাঁহাদিগের অনুগমন করিতে দেখিতে পাই। যে অরণ্যমধ্যে ধৃতরাষ্ট্র পত্নী গান্ধারী ও ভ্রাতৃবধূ কুন্তীদেবীর সহিত অগ্নিদগ্ধ হইয়া দিব্যগতি প্রাপ্ত হন, সেই অরণ্যের একাংশে তাঁহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে জটাধারী অনাহারে অস্থিচর্ম্মসার তপস্বী বিদুর যতিধর্ম্ম লাভ করেন।

যুধিষ্ঠির

মহাভারতের কথায় আছে, শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে যুধিষ্ঠিরের জন্মকালে এইরূপ আকাশ বাণী হইয়াছিল—

এষ ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যতি নরোত্তমঃ।

বিক্রান্তঃ সত্যবাক্ চৈব রাজা পৃথ্যাঃ ভবিষ্যতি॥ আ-প, ১২৩।৮

অর্থাৎ—এই বালকটি ধার্ম্মিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রধান, বিক্রমশালী, সত্যবাদী এবং পৃথিবীপতি হইবে।

শৈশব হইতে যুধিষ্ঠির ধীর কষ্টসহিষ্ণু এবং স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। পিতৃব্য বিদুরের ন্যায় তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রশংসনীয় ছিল। তিনি কদাচ কাহাকেও হিংসা করিতেন না, পাপকে তিনি ঘৃণা করিতেন, কিন্তু পাপীকে কোলে তুলিয়া সদুপদেশ দিতেন; পাপীর উপর তাঁহার ঘৃণা ছিল না। কথার দ্বারাও কাহাকে পীড়া দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। অপকারীর উপকার ও শত্রুকে মার্জ্জনা ছিল তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। গুরুজনের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া বিরুদ্ধপক্ষ তাঁহাকে নিগৃহীত করিতে কত প্রয়াসই পাইয়াছেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির কদাচ শ্রদ্ধাভাজনদিগের প্রতি তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করেন নাই।

কিশোর কালেই যুধিষ্ঠির বুঝিয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন নহেন, বিশেষতঃ ভীমের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ অতিশয় প্রবল।

তখনই তিনি এ সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক হইয়াছিলেন। কিন্তু পাছে দুর্য্যোধন কুপিত হন, এই আশঙ্কায় কথাটা অভিভাবকদের কর্ণগোচর করেন নাই। তিনি শুধু ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—এখন হইতে পরস্পরের রক্ষার্থ আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।

অস্ত্রশিক্ষা কালে অর্জ্জুনের বাণপ্রয়োগ-কৌশল দেখিয়া আচার্য্য দ্রোণ যখন মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেন, ভ্রাতৃগৌরবে যুধিষ্ঠিরের বুকখানি যেন তাহাতে আনন্দে দুলিয়া উঠিত। রঙ্গভূমিতে যেদিন অর্জ্জুনের অপূর্ব্ব অস্ত্রকৌশল সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল, সমবেত দর্শকবৃন্দ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন— এই তৃতীয় পাণ্ডবই কৌরবগণের রক্ষক হইবেন! তখন যুধিষ্ঠিরের কি আনন্দ! নিজের সম্বন্ধেও এরূপ প্রশংসাবাদ শুনিলে তিনি বোধ হয় এতটা উল্লসিত হইতেন না। রঙ্গভূমিতে কর্ণ যখন প্রবেশ করিলেন এবং অর্জ্জুনের অনুরূপ শস্ত্রকৌশল-প্রদর্শনে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সৌখ্যসূত্রে বদ্ধ হইলেন, তখন যুধিষ্ঠির ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এ সম্বন্ধে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের তখনকার মনভাব সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে—

যুধিষ্ঠিরস্যাপ্যভবত্তদামতির্ন কর্ণতুল্যোঽস্তি ধনুর্দ্ধরঃ ক্ষিতৌ।

আ-প, ১৩৮।২৫

অর্থাৎ—যুধিষ্ঠিরের বোধ হইল যে, পৃথিবী মধ্যে কর্ণতুল্য ধনুর্দ্ধর আর নাই। যুধিষ্ঠিরের মনে এই কর্ণভীতি কর্ণের মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবল ছিল।

কুমারগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পিতার এই আচরণে বিরক্ত ও ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া দুর্য্যোধন অন্ধ পিতাকে সুকৌশলে পাণ্ডব নিগ্রহে প্ররোচিত করিলেন। এই সম্পর্কেই বারণাবত প্রসঙ্গের অবতারণা।

ধৃতরাষ্ট্রই একদিন সভামধ্যে পাণ্ডবগণের সমক্ষে কথায় কথায় বারণাবত নগরীর এমন প্রশংসা করিলেন যে, তাহা দেখিবার জন্য যুধিষ্ঠিরের মনে কৌতূহল জাগিল। ইহার পরই সহসা তিনি পাণ্ডবগণকে ঐ নগরী দেখিতে যাইবার জন্য এক রকম আদেশ করিয়া ফেলিলেম। যুধিষ্ঠিরও অমনই জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দ্বিধাশূন্যচিত্তে বারণাবত যাত্রা করিলেন—ইহা যদি স্থির করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। মহাভারতের কথায় যুধিষ্ঠিরের বারণাবত যাত্রায় সম্মতি প্রদান সম্পর্কে এইরূপ উল্লেখ আছে—

ধৃতরাষ্ট্রস্য তং কামমনুবুধ্য যুধিষ্ঠিরঃ।

আত্মনশ্চাসহায়ত্বং তথেতি প্রত্যুবাচ তম্॥ আ-প, ১৪৪।১১

অর্থাৎ—যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া এবং আপনাকে সহায়বিহীন জানিয়া এই বলিয়া উত্তর দিলেন—'আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে।' ইহার পর যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ, বল্মীক, সোমদত্ত, কৃপ, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, অসত্যবর্ণ, ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিতগণ এবং অন্তঃপুরচারিণী গান্ধারী দেবীকে অতি দীনভাবে মৃদুস্বরে জানাইলেন—

রমণীয়ে জনাকীর্ণে নগরে বারণাবতে

সগণাস্তত্র যাস্যামো ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ॥

প্রসন্নমনসঃ সর্ব্বে পুণ্যা বাচো বিমুঞ্চত।

আশীর্ভির্বৃংহিতানস্মান্ন পাপং প্রসহিষ্যতে॥

অর্থাৎ—আমরা রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে অনুচরবর্গের সহিত জনাকীর্ণ পরম রমণীয় বারণাবত নগরে গমন করিতেছি। আপনারা প্রসন্নমুখে পুণ্য বাক্য প্রয়োগ করুন যে, আপনাদের আশীর্ব্বাদের প্রভাবে আমরা যেন পাপস্পৃষ্ট না হই।

ইহাতে মনে হয় যে, বারণাবতের উল্লেখ ও তথায় পাণ্ডবদিগকে পাঠাইবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ-বাক্যের মধ্যে যুধিষ্ঠির একটা দুরভি-সন্ধির সন্দেহ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া তিনি শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয়স্বজন এবং দেবী গান্ধারীর সমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে, রাজার আদেশানুসারেই তাঁহারা বারণাবত নামক স্থানটি রমণীয় দেখিতে যাইতেছেন। এক্ষণে তাঁহারা এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, তাঁহাদের যেন কোনরূপ অকল্যাণ না হয়।

বুদ্ধিবলে শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দুষ্ট অভিসন্ধি অবগত হইয়াও বিনাপ্রতিবাদে তাহার সমর্থন যুধিষ্ঠিরের জীবনে বহুবার বহু ব্যাপারে সংঘটিত হইয়াছে। অক্ষক্রীড়ার সম্পর্কেও আমরা তাঁহার এই দুর্ব্বলতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রতিজ্ঞামুক্তির পর রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনার সময় ধৃতরাষ্ট্র যখন সঞ্জয় দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে স্বার্থত্যাগের সদুপদেশ দেন, তখন তাহাতে অভিভূত হইয়া যুধিষ্ঠিরই সর্ব্বপ্রথম রাজ্যাংশের ন্যায্য দাবী ত্যাগ করিয়া পাঁচখানি মাত্র গ্রামের বিনিময়ে সন্ধির প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

পঞ্চপাণ্ডব সত্যে প্রতিষ্ঠিত। বাক্যে বা মনে তাঁহারা সত্যভ্রষ্ট হইতে পারেন না। সত্যের এই মর্য্যাদা রক্ষা করিতেই পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদীকে পঞ্চপাণ্ডবের সহধর্ম্মিণী হইতে হইল। দ্রৌপদীকে লইয়া পর্ণশালার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভীমার্জ্জুন জননী কুন্তীর উদ্দেশে কহিলেন, 'মাতঃ! আজ এক অপূর্ব্ব ভিক্ষা লাভ হইয়াছে।' ভিক্ষার দ্রব্য না দেখিয়াই গৃহমধ্য হইতে কুন্তীদেবী কহিলেন, 'যাহা পাইয়াছ, সকলে মিলিয়া ভোগ কর।' কিন্তু পরক্ষণে বাহিরে আসিয়া দ্রৌপদীকে দেখিয়াই তিনি আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—আমি একি বলিলাম! এখন আমার এই কথার সত্যতা কেমন করিয়া রক্ষা হইবে!

সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির সত্যপরায়ণা মাতার অবস্থা উপলব্ধি করিলেন। মাতার কথা রক্ষা করিতে হইলে লোকাচার লঙ্ঘন জনিত নিন্দা গ্রহণ করিতে হয়, আবার মাতার আজ্ঞাপালন না করিলে, মাতার বাক্য মিথ্যা হয় এবং তাঁহারাও মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনকারী হইয়া পড়েন। তথাপি তিনি অর্জ্জুনের মন বুঝিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! দ্রৌপদী তোমারই জয়লব্ধ ধন। অতএব তুমিই যথারীতি ইহাকে বিবাহ কর।

কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন,—হে আর্য্য! এরূপ আজ্ঞা করিবেন না। আমরা পঞ্চ ভ্রাতাই এই কন্যার সহিত আপনার নিদেশবর্ত্তী হইতেছি। আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমাদের মধ্যে কেহই তাহা পালন করিতে বিমুখ হইবে না।

যুধিষ্ঠির স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন, চারি ভ্রাতার মুগ্ধ দৃষ্টি দ্রৌপদীর দিকে নিবদ্ধ এবং দ্রৌপদীও পঞ্চপাণ্ডবকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি বুঝিলেন, মাতার বাক্য সত্য ও সার্থক করিতে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃ চতুষ্টয় আগ্রহশীল। তখন তিনি ভ্রাতৃভেদ আশঙ্কা করিয়া এই ভাবে ইহার নিষ্পত্তি করিলেন,

সর্ব্বেষাং দ্রৌপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি নি নঃ শুভা। আ-প ১৯২।১৬
অর্থাৎ এই শুভলক্ষণা দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবে।

যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া এই যে কথা নির্গত হইল, পরে সবান্ধব দ্রুপদ-রাজার পক্ষ হইতে এই অদ্ভুত বিবাহের বিরুদ্ধে বহু প্রতিবাদ উঠিলেও, ইহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না; শেষ পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্যে

অটল রহিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে জানাইলেন, ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, আমরা পূর্ব্বপুরুষকৃত নিয়মানুসারে চলিয়া মনে করি যে ধর্ম্ম রক্ষা করিলাম ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থাভেদে ধর্ম্মভেদ হইয়া থাকে। এস্থলে প্রথমত মাতা আমাদিগকে এ বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া সকলেই অবগত আছেন যে, আমার স্বভাবতঃই অধর্ম্মে মতি হয় না, অথচ এ ক্ষেত্রে আমার এরূপ অনুষ্ঠান করাই নানা কারণে কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। সুতরাং আপনারা এবিষয়ে আর শঙ্কা করিবেন না, ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানিবেন।

সকলের যুক্তি খণ্ডন পূর্ব্বক নিজের সিদ্ধান্তের উপর সুদৃঢ় আস্থা রাখিয়া প্রতিবাদী পক্ষকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিতে যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিত্ব ও বিচার শক্তির বিশেষ পরিচয় এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। তাঁহার যুক্তির দুইটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, আমি অধর্ম্মাচারী নহি, সুতরাং এই প্রস্তাব যদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আমার মনে কি প্রকারে উদয় হইল ? দ্বিতীয়তঃ, গুরুজন যাহা আদেশ করেন, তাহা কখনই অধর্ম্ম হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধি ও এরূপ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে, কেহ কি কখনও নিষ্ঠার সহিত এরূপ প্রস্তাব করিতে পারেন ! এই অসামান্য মাতৃভক্ত ও আত্মপ্রত্যয়ী মনীষীর মর্ম্মবাণী সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াই অবশেষে দ্রুপদকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, এ বিবাহে আমার আর কোন দ্বিধা নাই। পাণ্ডবগণ বিধি-পূর্ব্বক কৃষ্ণাকে গ্রহণ করুন, আমার কন্যা দ্রৌপদী তাঁহাদের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এই বিবাহের পরই পাণ্ডবগণের ভাগ্যোদয় হইল। বিপুল সহায় সম্পদ লাভের সঙ্গে তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক হস্তিনায় আহূত এবং কতিপয় গ্রামসহ অরণ্যসঙ্কুল সমুদয় খাণ্ডবপ্রস্থের আধিপত্য লাভ

করিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় দুর্গম খাণ্ডব-বন দগ্ধ করিয়া পাণ্ডবগণ মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠা করিলেন। দানবশিল্পী ময়ের নির্ম্মাণ পারিপাট্যে ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রপুরীর মত অপূর্ব্ব শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রপ্রস্থ প্রতিষ্ঠার পর রাজসূয় যজ্ঞের বিরাট আয়োজন। এই সম্পর্কে বলদর্পিত জরাসন্ধকে সংহার করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীমার্জ্জুনকে মগধে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। এই সময় যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মনঃস্বরূপ এবং ভীম ও অর্জ্জুন আমার দুই চক্ষুঃস্বরূপ। আমি কেমন করিয়া তোমাদিগকে বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানে প্রেরণ করিব?

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের কথায় আশ্বস্ত হইয়া যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। রামায়ণের রাজা দশরথও একদিন ঠিক এই ভাবেই তাঁহার প্রাণাধিক রাম ও লক্ষ্মণকে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

জরাসন্ধবধ ও পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয়ের পর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যুধিষ্ঠির দেশপতির মর্য্যাদা লাভ করিলেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের মহাসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞের পর হস্তিনায় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে সহস্র স্তম্ভ সমন্বিত শতদ্বার বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য বিস্তারে একক্রোশ পরিমিত সুবিশাল দ্যূত-সভা নির্ম্মিত হইয়া তাহার দিকে সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। দ্যূত-ক্রীড়ায় আহূত হইয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। ক্রীড়ায় আসক্তি, জ্যেষ্ঠতাতের আহ্বান এবং আহ্বায়করূপে পিতৃব্য বিদুরের উপস্থিতি এই তিনটি অবস্থাই যুগপৎ মহানুভব যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ক্রীড়ায় উত্তেজিত করিয়া তুলে। ক্রীড়ায় বা যুদ্ধে প্রতিপক্ষ আহ্বান

করিলে, সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবিধেয় ও কাপুরুষতার পরিচায়ক। এই সর্ব্বনাশকারী দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরের আসক্তিও যে অল্প ছিল না এবং সেই ক্রীড়ায় সুনিপুণ না হইয়াও তিনি যে অতি অবিবেচকের মত পণ সকল নির্দ্ধারণ করিয়া হৃতর্ব্বস্ব হন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার পর ভাগ্যবশে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রৌপদীর প্রার্থিত ও প্রাপ্ত বরের কল্যাণে প্রনষ্ট ধন সম্পত্তির সহিত মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার ক্রীড়াসক্তি হ্রাস পায় নাই। পুনরায় দ্যূতের আহ্বানে উত্তেজিত হইয়া যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব পরাজয় জনিত অবমাননার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে দৈবপরিবর্ত্তনের প্রতি আশাযুক্ত হইয়া পুনরায় সেই ভয়াবহ দ্যূতসভায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং যে সভায় তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি চরম লাঞ্ছনা হইয়াছিল, তাহারই স্মৃতিকণ্টকিত সভায় ক্রীড়ামত্ত হইলেন।

কিন্তু মহানুভব যুধিষ্ঠির নিজের এই দুর্ব্বলতা পরে যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, কাম্যক বনে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের সহিত কথোপকথন সূত্রেই তাহা জানিতে পারা যায়। তথায় এই সর্ব্বনাশকর দ্যূতক্রীড়া সম্বন্ধে নিজের অনীতি ও অবিবেচনার জন্য যুধিষ্ঠির যে আক্ষেপ করেন, তাহা এইরূপ---

তস্মাৎ শঠঃ কিতবঃ প্রত্যদেবীৎ সুযোধনার্থং সুবলস্য পুত্রঃ ॥
মহামায়ঃ শকুনিঃ পার্ব্বতীয়ঃ সভ্যমধ্যে প্রবপন্নক্ষপূগাম্।
অমায়িনং মায়য়া প্রত্যজৈষীৎ ততোঽপশ্যং বৃজিনং ভীমসেন ॥
অক্ষাংশ্চ দৃষ্ট্বা শকুনের্যথাবৎ কামানুকূলানযুজো যুজশ্চ।
শক্যং নিয়ন্তুমভবিষ্যদাত্মা মন্যুস্তু হন্যাৎ পুরুষস্য ধৈর্য্যম্ ॥
যন্তুং নাত্মা শক্যতে পৌরুষেণ মানেন বীর্য্যেণ চ তাত নদ্ধঃ।
ন তে বাচো ভীমনোভ্যসূয়ে মন্যে তথা তদ্ভবিতব্যমাসীৎ ॥

ব, প ৩৪।৩৬

ভীমের কথার উত্তরে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিতেছেন,—আমি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের নিকট হইতে রাষ্ট্রের সহিত রাজ্য হরণ করিবার নিমিত্তই দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, কপট দ্যূতবিদ্ সুবলপুত্র শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করে। হে ভীমসেন! পর্ব্বতদেশীয় শকুনি মহাকাপট্যপরায়ণ, আমি নিষ্কপট; সুতরাং সে কাপট্যদ্বারা সভামধ্যে অক্ষ সকল নিক্ষেপ করিয়াই আমাকে পরাজয় করিল এবং তাহাতেই এই বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। আমি দ্যূত ক্রীড়াকালে যখন শকুনির হস্তনিক্ষিপ্ত অক্ষগুলিকে তাহার কামনার অনুকূলেই পড়িতে দেখিয়াছিলাম, তখনই মনকে সংযত করিতে পারিতাম। কিন্তু পুরুষের ক্রোধ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মন পুরুষত্ব, বীর্য্য বা অভিমানে আবদ্ধ হইলে তাহাকে নিয়মে রাখা অসাধ্য হয়; অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক উক্ত দ্যূতক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলাম না। সুতরাং তোমার বাক্যে মন ক্ষুব্ধ হইতেছে না, এই বিপদকে ভবিতব্যের বিধান বলিয়াই স্বীকার করিতেছি।

নিজের দোষ ত্রুটি, মনের দুর্ব্বলতা, দ্যূতে আসক্ত হইবার কারণ, একে একে সমস্তই সংক্ষেপে কি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিলেন! ইহা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় চিত্তশুদ্ধিসম্পন্ন মহানুভবের পক্ষেই সম্ভব। শুধু এইখানে তাঁহার আক্ষেপ সমাপ্ত হয় নাই। পরবর্ত্তী ত্রুটি—দ্বিতীয়বার দ্যূতে প্রবৃত্ত হইবার আখ্যানটিও তিনি এইরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ভীমসেনকে শুনাইতেছেন;—আমরা যখন ব্যসনাপন্ন ও দাসভাব প্রাপ্ত হইলাম, তখন দ্রৌপদীই সেই বিপদ্ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর আমরা দ্যূতক্রীড়া নিমিত্ত আহূত হইয়া সভায় প্রবেশ করিলে সর্ব্বসমক্ষে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ক্রীড়ার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আমি 'তথাস্তু'

বলিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছিলাম। তখন তোমরা কেহই আমাকে নিবারণ কর নাই। সেই ক্রীড়াতেও আমি পরাজিত হইয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম। হে ভীমসেন! দ্যূতক্রীড়াকালে তুমি আমার বাহুদ্বয় দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলে, অর্জ্জুন তোমাকে নিবারন করিয়াছিল। কিন্তু যদি তুমি তাহা করিতে, তাহা হইলে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিত না।

যুধিষ্ঠিরের আদর্শ চরিত্রালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, নিজের অপরাধ সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ সচেতন এবং মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন; নীতি ও সনাতন ধর্ম্ম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রিয়জনের মতবাদের প্রতিবাদ করিতে এবং তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি একান্ত নির্ভীক ও সতর্ক। এই প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর সহিত তাঁহার বিতর্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কাম্যকবনে দ্রৌপদী ইন্দ্রপ্রস্থের অতুল ঐশ্বর্য্যের সহিত বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার তুলনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—এই সকল দেখিয়াও আপনি যখন শান্ত থাকিতে পারিয়াছেন, তখন আপনি যে নিতান্ত ক্রোধশূন্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকে বলে, ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় সর্ব্বদাই পরাভূত হয়। শত্রুকে ক্ষমা করিলে উন্নতির কোন আশাই থাকে না।

যুধিষ্ঠির ইহার উত্তরে প্রসন্ন বদনে কহিলেন, ক্রোধ মঙ্গল অমঙ্গল উভয়েরই কারণ, সুতরাং দেশ কাল বিবেচনা করিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত। ক্ষমাই সনাতন ধর্ম্ম, সেই জন্যই আমি দুর্য্যোধনাদির প্রতি ক্ষমা অবলম্বন করিতেছি।

যুধিষ্ঠিরের কথাগুলি দ্রৌপদীর মর্ম্মস্পর্শ করিল না, তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—নিশ্চেষ্টভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনি যে কি ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝি না। আর্য্যগণ বলিয়া

থাকেন যে, যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করেন। কিন্তু আপনার ধর্ম্ম আপনাকে কোথায় রক্ষা করিল? দুর্ব্বলের প্রতি বিধাতাও নির্দ্দয়, বলই প্রধান; দুর্ব্বলগণ প্রবলের কৃপার পাত্র, একান্ত অধীন, তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বুঝাইলেন,—অল্প বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া বিধাতার কার্য্যের বিচার করা অনুচিত। সর্ব্বদাই উপস্থিত ফললাভের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, অনেক সময় চরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ নিত্য সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানের ক্ষণভঙ্গুর দুঃখ সকল উপেক্ষা করাই উচিত।

দ্রৌপদী কহিলেন,—আমি ধর্ম্মের অবমাননা বা বিধাতার নিন্দা করিতে চাহি নাই। যে দারুণ দুঃখ আমি ভোগ করিয়াছি, তাহার জন্যই বিলাপ করিতেছিলাম। আমি ত দেখিতেছি কর্ম্মই সুখ। কর্ম্মদক্ষ পুরুষই ঐশ্বর্য্য লাভ করে। সর্ব্বদা বিচার ও সংশয় অনর্থের মূল। সম্প্রতি এই অনর্থই আমরা লাভ করিয়াছি। আপনারা যদি দৃঢ় চিত্তে পুরুষকার অবলম্বন করেন, পরিণামে রাজ্যলাভ না হইলেও তাহাতে সুখ আছে।

ভীমসেন এই সময় দ্রৌপদীর উত্তেজক বাক্যগুলি শ্রবণে উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন,—দ্রৌপদী যথার্থই বলিয়াছেন যে, পুরুষোচিত পরাক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক আমাদের রাজ্যলাভ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। যে আচরণের দ্বারা মিত্রের দুঃখ এবং শত্রুর সুখ হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে না—ব্যসন বলে। দুর্য্যোধন কপটতা দ্বারা আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়াছে, আপনি কোন্ ধর্ম্ম অনুসারে তাহা প্রত্যাহরণে বিরত রহিয়াছেন?

যুধিষ্ঠির এবার বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের মত ভীমের উত্তেজক কথাগুলির যে প্রত্যুত্তর দিলেন, তাহাতেই ভীম ধীরভাব অবলম্বন করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—ভাই, তোমার যে-পরিমাণ সাহস ও শক্তি, সে পরিমাণ বুদ্ধি ও বিবেচনা নাই। দ্যূতসভায় দেখিয়াছ ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ, সমাগত রাজন্যবৃন্দ আমাদের দুর্দ্দশায় কোন প্রতিবাদই করেন নাই। আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হওয়ায় দুর্য্যোধন সমস্ত সৈন্যবল ও রাজগণকে আয়ত্তাধীন করিয়া লইয়াছে। অধীন বীরপুরুষগণের সম্মানরক্ষায় দুর্য্যোধন যেরূপ যত্নবান্, তাহাতে তাহার পক্ষভুক্তগণ কেহই আমাদের পক্ষ সমর্থন করিবে না। এ অবস্থায় কোন্ উপায়ে তুমি কৌরবগণকে পরাভূত করিবে? অন্যের কথা পরে থাকুক, একমাত্র অভেদ্য কবচধারী মহাবীর কর্ণের যুদ্ধ-নৈপুণ্যের কথা মনে উঠিলে আমার সুনিদ্রা হয় না।

যুধিষ্ঠির কখনও কৌরবগণকে হীনশক্তি জ্ঞানে উপেক্ষা করেন নাই। কর্ণের সম্বন্ধে তাঁহার অতিশয় আতঙ্ক ছিল বলিয়াই, তিনি অর্জ্জুনকে কঠোরতম শস্ত্র সাধনায় প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যেও তাহার অন্যথা করিতেন না। দ্রৌপদীকে উপদেশছলে বলিয়াছিলেন—ক্ষমাই সনাতন ধর্ম্ম। যে দুর্য্যোধন তাঁহাকে বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে আসিয়া গন্ধর্ব্বহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া এবং ভীমার্জ্জুন দ্বারা গন্ধর্ব্ব হস্ত হইতে তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া তিনি এই ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরকে এইভাবে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম পালন করিতে দেখিয়া শত্রু মিত্র যুগপৎ চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরের সুচিন্তিত নির্দ্দেশটি বর্ত্তমান আত্মকলহপরায়ণ ভারতবাসীর কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা উচিত। ভীমসেন যখন মদমত্ত দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে নির্লিপ্ত থাকিতে অনুরোধ করিতে-ছিলেন, তিনি তখন আবেগময়ী ভাষায় এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেন—

ভবন্তি ভেদা জ্ঞাতীনাং কলহাশ্চ বৃকোদর !
প্রসক্তানি চ বৈরাণি কুলধর্ম্মো ন নশ্যতি ॥
যদা তু কশ্চিজ্‌জ্ঞাতীনাং বাহ্যঃ প্রার্থয়তে কুলম্‌ ॥
ন মর্ষয়ন্তি তৎ সন্তো বাহ্যেনাভিপ্রধর্ষণম্‌ ॥

ব-প, ২৪২।১-৩

অর্থাৎ—হে বৃকোদর ! জ্ঞাতিগণ মধ্যে পরস্পর বহুতর ভেদ ও কলহ হয় এবং বিরোধভাবও প্রসক্ত থাকে, কিন্তু কুলধর্ম্ম কদাচ নষ্ট হয় না। যদি বাহিরের কেহ জ্ঞাতিগণের কুল ধর্ষণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে সৎপুরুষেরা বাহিরের লোকের সেই প্রভাব কখন সহ্য করিতে পারেন না।

এই বনবাসকালেই কিছু পূর্ব্বে যিনি কৌরবগণের শক্তিপ্রাচুর্য্যের উল্লেখ করিয়া উত্তেজিত ভীমকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই শক্তিমান কৌরবগণকে গন্ধর্ব্ব-সমরে নির্জ্জিত ও বন্দীকৃত দেখিয়া তিনিই ভ্রাতৃগণকে উত্তেজিত কণ্ঠে যুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া বলিতেছেন—

শরণঞ্চ প্রপন্নানাং ত্রাণার্থঞ্চ কুলস্য চ।
উত্তিষ্ঠধ্বং নরব্যাঘ্রাঃ সজ্জীভবত মা চিরম্‌। ২৪২।৬

হে পুরুষপ্রবর ! শরণাগত জ্ঞাতিদের পরিত্রাণ এবং কুলের রক্ষাকল্পে অবিলম্বে তোমরা উত্থিত ও সজ্জীভূত হও ; বিলম্ব করিও না। ইহাই যুধিষ্ঠির-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

—:*:—

দুর্য্যোধন

শতশৃঙ্গ পর্ব্বতস্থিত আশ্রমে যে দিন পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিনই হস্তিনার রাজপ্রাসাদে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্য্যোধন ভূমিষ্ঠ হন। দুর্য্যোধনের মাতা গান্ধারী দেবী মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট স্বামীর ন্যায় অমিতবলশালী পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বরে পর পর দুর্য্যোধনাদিক্রমে এক শত পুত্র এবং দুঃশলা নাম্নী এক কন্যার উৎপত্তি হয়।

দুর্য্যোধন মহাভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ। একাধারে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ সম্পন্ন এই পুরুষসিংহের চরিত্রটি মানবসুলভ দোষে গুণে রাজোচিত ধৈর্য্য বীর্য্য প্রতাপ ও দম্ভের সংমিশ্রণে মহাভারতে চিত্রিত অসংখ্য চিত্রগুলির মধ্যে এমন একটা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাকে প্রাধান্য না দিয়া উপায় নাই।

মহাভারতে ভ্রাতৃগণসহ বালক দুর্য্যোধনকে আমরা পাণ্ডবগণের সমক্ষেই প্রথম দেখিতে পাই। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণের সহিত হস্তিনার বাহিরে কুরুজাঙ্গাল নামক স্থানে শতশৃঙ্গপর্ব্বতবাসী মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে সমাগত সমাতৃক পঞ্চ পাণ্ডবকে সম্বর্দ্ধনা করিতে দুর্য্যোধনাদি কুরুবালকগণও উপস্থিত। সমবয়স্ক পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত কৌরবগণের সাক্ষাৎকার এই প্রথম।

ইহার পর আমরা দেখিতে পাই, হস্তিনার পৈতৃক প্রাসাদেই পাণ্ডবগণ পরমানন্দে রাজভোগে দুর্য্যোধনাদি শতভ্রাতার সহিত বাল্যক্রীড়া-কৌতুকে বৃদ্ধি পাইতেছেন। দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অপ্রসন্ন বা হিংসাপরায়ণ—এ পর্য্যন্ত মহাভারতে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু দুর্য্যোধনের মনোবৃত্তি এই বালকবয়সেই হঠাৎ দূষিত হইয়া উঠিল কেন এবং কাহার আচরণে দুর্য্যোধন শৈশবেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন ? দুরভিসন্ধির মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে বসিয়া আমরা যদি ভীমের বাল্যচপলতা সুলভ হঠকারিতাগুলির উল্লেখ করি, তাহা হইলে সম্ভবতঃ এই প্রশ্নের অনেকটা মীমাংসা হইতে পারে। ভীমের ক্রীড়া ও আচরণ সম্পর্কে মহাভারতকার লিখিতেছেন—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যখন হৃষ্টচিত্তে খেলাধূলা করিতেন, ভীম সেই সময় সহসা তাঁহাদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া দিতেন। কখনও তাহাদের দুইজনকে পরস্পর আঘাতিত করিয়া, কখনও কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভূমিতে ঘর্ষণ করিয়া, জলক্রীড়া-কালে বলপূর্ব্বক জলমগ্ন করিয়া দিয়া, বৃক্ষারূঢ় হইলে বৃক্ষকাণ্ডে আঘাত-পূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে ভূপাতিত করিয়া,—বিবিধ প্রকারে ভীম ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

বালক দুর্য্যোধন বাল্যকাল হইতে ভ্রাতৃগণের প্রতি অতিশয় স্নেহ-পরায়ণ এবং তাঁহার অনুজগণ প্রত্যেকেই জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুরক্ত। সেই ভ্রাতাদের প্রতি ভীমের এইরূপ অত্যাচার দুর্য্যোধনকে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিল। অর্জ্জুন তখনও ধনুর্দ্ধর হন নাই এবং যুধিষ্ঠির নকুল বা সহদেবের শক্তিতে দুর্য্যোধন শঙ্কিত নহেন ; তাঁহার যত কিছু উদ্বেগ ভীমকে লইয়া। ভীমের সম্বন্ধে এই দুশ্চিন্তা এবং সেই সঙ্গে দুরভিসন্ধি এই প্রথম তাঁহার চিন্তাশীল মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। যে ভীম তাঁহার ভ্রাতৃগণকে অকারণ যখন তখন নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়ন

করিয়া থাকেন সেই ভীমকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য বালক দুর্য্যোধন সুকৌশলে যে চক্রান্ত-জাল সৃষ্টি করিলেন, তাহাকে বালকোচিত বলা যায় না -বিচক্ষ। কূটকৌশলী চক্রান্তকারীর বুদ্ধিমত্তাই তাহাতে সুপ্রকাশ। কিন্তু বালকবয়সেই এই অসাধারণ কূটবুদ্ধি যেন সহজাত সংস্কারের মতই দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়াছিল।

দুর্য্যোধনের মস্তিষ্কপ্রসূত বুদ্ধির প্রভাবে গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপন-পূর্ব্বক এক রমণীয় ক্রীড়াস্থান নির্ম্মিত এবং নানাবিধ ভোজ্যে তাহা পূর্ণ করা হইল। তাহার পর দুর্য্যোধন নিজেই পাণ্ডবগণকে সমাদরে আহ্বান করিয়া তথায় ক্রীড়ার্থ লইয়া গেলেন।

পাণ্ডবগণ দেখিলেন, গঙ্গাতীর ব্যাপিয়া পটাবাস (তাঁবু) গুলি এক মনোরম নগরীতে পরিণত হইয়াছে। সিংহদ্বার, সুসজ্জিত বিশ্রাম-গৃহ, ভোজ্যপূর্ণ ভোজন-মণ্ডপ, জলক্রীড়ার উপযোগী বিবিধ যন্ত্রাদির সংস্থান প্রভৃতি কিছুর অপ্রতুল সেখানে নাই। পরমানন্দে বালকগণ জলক্রীড়ায় রত হইলেন। ক্রীড়ান্তে ভূরিভোজের বিপুল আয়োজন শ্রান্ত বালকগণকে বিশেষতঃ ভীমকে অতিশয় আনন্দ দান করিল। ভীমের আনন্দ দেখিয়া দুর্য্যোধনের মুখেও হাসি ফুটিল, সে হাসি কি ক্রূর! কিন্তু পাণ্ডবগণকে সন্দিগ্ধ হইবার কোন সুযোগই দুর্য্যোধন দিলেন না। তাঁহারই নির্দ্দেশে ভোজনানন্দে প্রমত্ত বালকগণ সকৌতুকে পরস্পরের মুখে মিষ্টান্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সুযোগটুকুরই প্রতীক্ষা দুর্য্যোধন করিতেছিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ পরমোল্লাসে ভীমের মুখে মিষ্টান্ন প্রদান করিলেন। ভীমকে বিষদানের অভিসন্ধিতে সেস্থানে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন সুরক্ষিত ছিল। পঞ্চ-পাণ্ডবের মধ্যে অপর চারিজনের প্রতি কোনরূপ হিংসা না করিয়া সুকৌশলে ও অতিশয় সন্তর্পণে ভীমের মুখেই শুধু সেই বিষাক্ত মিষ্টান্ন দিয়া দুর্য্যোধন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। ভোজনান্তে পুনরায় ক্রীড়া চলিল এবং সেই

ক্রীড়ার মধ্যেই এমন সতর্কতা সহকারে বিষপ্রভাবে মূর্চ্ছিতপ্রায় ভীমকে গঙ্গাসৈকতে লতাপাশাবদ্ধ করিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল যে, পাণ্ডবগণের কেহই তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না।

পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে দুর্য্যোধনের অন্তরে বিদ্বেষবিকাশের আর একটি কারণ—তাহাদিগের প্রতি ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখ কুরুবৃদ্ধগণের স্নেহপ্রীতির প্রাচুর্য্য। পিতৃহীন নিঃসহায় পর্ব্বতাঞ্চলে বয়ঃপ্রাপ্ত এই বালকগণের প্রতি ভীষ্ম বিদুরের স্নেহপূর্ণ সহানুভূতি হয় ত অন্যায় বা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু অভিমানী দুর্য্যোধন ভীষ্ম প্রভৃতির আচরণে পক্ষপাতিত্ব উপলব্ধি করিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইতেন।

বাল্যকাল হইতেই দুর্য্যোধন যে প্রভুশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার প্রকৃতি হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধি শক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে যাঁহারা পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া দুর্ব্বার গতিতে প্রভুত্বের শকট চালাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, দুর্য্যোধন তাঁহাদেরই অন্যতম। শৈশব হইতেই তিনি নিয়ামক, প্রভু, আদেশদাতা; পারিপার্শ্বিক প্রত্যেককেই তিনি নিজের ক্ষমতাধীন করিতে আগ্রহশীল; এই দুঃসাহসী দাম্ভিক দুর্ম্মুখ ও দুর্দ্ধর্ষ বালকের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে যেন সকলেই কুণ্ঠিত।

ভীম যখন মৃত্যুমুখ হইতে দৈবের কৃপায় কোন প্রকারে নিষ্কৃতি পাইয়া প্রাসাদে ফিরিলেন, তখন তাঁহার মুখে দুর্য্যোধনের ভয়াবহ আচরণের কাহিনী শুনিয়া কুন্তী দেবী অশ্রুমোচন করিলেন এবং যুধিষ্ঠির ভীমকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন—

'তূষ্ণীম্ভব ন তে জল্প্যমিদং কার্য্যং কথঞ্চন।'

আ-প, ১২৯।৩৭

অর্থাৎ—হে ভ্রাতঃ! মৌনাবলম্বন কর, এ সকল কথা কদাচ ব্যক্ত করিও না।

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাসাদেও বালক দুর্য্যোধন এমনই প্রভাব ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ করিতেও পাণ্ডবগণ সাহসী হন নাই। সম্ভবতঃ দুর্য্যোধনও তাঁহার দুরভিসন্ধি এমন কৌশলে সিদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সন্দেহ করিবার কোন পথ রাখেন নাই।

এই ঘটনার পর ভীমকেও তাঁহার বাল্যচাপল্য সংযত করিতে হইয়াছিল। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধন সহজ পাত্র নহেন। কিন্তু ভীমের প্রত্যাবর্ত্তনে দুর্য্যোধন বিস্ময়াভিভূত হইলেন। তিনিও বুঝিলেন, তাঁহার এই বৈরী সামান্য নহেন—অসাধারণ। বিষভক্ষণ করিয়াও বাঁচিতে জানে, জলে ডুবিয়াও মরে না।

দুর্য্যোধন যে কিরূপ দূরদর্শী ও বিচক্ষণ, অশ্বত্থামা এবং কর্ণের সহিত তাঁহার সৌখ্য স্থাপন হইতেই তাহা জানিতে পারা যায়। কুরুবালকগণের আচার্য্যপদে বৃত হইয়া দ্রোণ যেমন সপরিবারে হস্তিনায় আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, অমনই দুর্য্যোধন সর্ব্বাগ্রে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাকে প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিয়া প্রিয়বন্ধুর মর্য্যাদা দিলেন। দুর্য্যোধনের ঔদার্য্য ও বন্ধুবাৎসল্য দ্রোণপুত্রকে এমনই অভিভূত করিয়াছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত ইনি ছিলেন দুর্য্যোধনের গুণমুগ্ধ আজ্ঞাধীন সুহৃদ্।

প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রবল বৈরী ভীমকে বিনাশ করিবার দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইলে, দুর্য্যোধন দৈহিক শক্তিতে ও রণকৌশলে ভীমের সমকক্ষ হইবার জন্য নিষ্ঠার সহিত শক্তিচর্চ্চায় অবহিত হইয়াছিলেন। বালক বয়সেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহাদের এই সম্প্রীতি স্থায়ী হইবে না—ভবিষ্যতে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। অশ্বত্থামা ও কর্ণের

প্রতি তাঁহার আচরণ বালকসুলভ স্নেহানুরক্তির পরিচায়ক নহে, তাহার মূলে এই তরুণ রাজনীতিজ্ঞের সুচিন্তিত সঙ্কল্প প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

কর্ণ যখন অনাহূত ভাবে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া অর্জ্জুন-প্রদর্শিত শস্ত্রবিদ্যার সম্যক্ পরিচয় দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন, দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—

স্বাগতং তে মহাবাহো দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদ !
অহঞ্চ কুরুরাজ্যঞ্চ যথেষ্টমুপভুজ্যতাম্।

আঃ-প, ১৩৭।১৪

অর্থাৎ—হে মানদ ! আমার সৌভাগ্যক্রমেই আপনি উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি এই কুরুরাজ্য ইচ্ছানুরূপ উপভোগ করুন।

উপযুক্ত সুযোগ গ্রহণ করিতে বালক বয়সেই দুর্য্যোধন সুপটু ছিলেন। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বজনপ্রশংসিত অর্জ্জুনের গর্ব্বখর্ব্বকারী এই প্রিয়দর্শন সুলক্ষণযুক্ত তরুণ বীরকে অভিভূত ও পক্ষভুক্ত করিবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য হইয়া তিনি তাঁহাকে কুরুরাজ্য ভোগ করিতে আহ্বান করিয়া ফেলিলেন। আরও আশ্চর্য্য, বালক দুর্য্যোধনের এমনই প্রভাব যে, কুরুবৃদ্ধগণ সভায় উপস্থিত থাকিয়াও কথাটার কোন প্রতিবাদ করিলেন না। কর্ণের উপস্থিতির পর রঙ্গসভায় দুর্য্যোধনের দম্ভমূলক কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়, যেন তিনিই এখানে মুখপাত্র বা কুরুরাজ্যের পরিচালক।

কৃপাচার্য্য যে সময় অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধকামী কর্ণকে তাঁহার কুল-পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়া স্তব্ধ করিয়া দিলেন, তখন তাহার উত্তরে কর্ণের অনুকূলে দুর্য্যোধনের উক্তি কি সুস্পষ্ট ও তেজোদৃপ্ত! তিনি কৃপাচার্য্যকে বুঝাইয়া দিলেন—শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ত্বের তিনটি কারণ দেখা যায়। ক্ষত্রিয় বংশে উৎপত্তি, বীরত্ব এবং বুদ্ধিবলে সৈন্যচালনা। তথাপি

রাজা ভিন্ন অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে যদি অর্জ্জুনের অনিচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিতেছি।

শুধু মুখের কথা নয় বা মুখে মুখে রাজ্যদান নহে; দুর্য্যোধনের আদেশে তৎক্ষণাৎ সেই রঙ্গস্থলেই সুবর্ণ পীঠ আনাইয়া কর্ণকে তাহাতে উপবেশন করান হইল; মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া লাজ কুসুম গঙ্গাবারি ও স্বর্ণাদি দ্বারা যথাবিধি তাঁহাকে অভিষিক্ত ও রাজশ্রীসম্পন্ন করিয়া দিলেন। রাজনীতিতে দুর্য্যোধনের এই অসাধারণ দক্ষতাপূর্ণ কর্ম্মতৎপরতা হইতে মনে হয় যে, পঠদ্দশাতেই তিনি অন্ধ পিতার সিংহাসনপার্শ্বে বসিয়া রাজ্যের রশ্মি ধরিবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। এমন কি, কতিপয় সমৃদ্ধ রাজ্য পর্য্যন্ত নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিলেন, অঙ্গ রাজ্য তাহাদেরই অন্যতম। কর্ণকে অঙ্গরাজ্য প্রদান এবং বিনা-প্রতিবাদে সেই রাজ্যে কর্ণকে অভিষিক্ত করিবার বিবরণ হইতেই ইহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যাঁয়।

ইহার পর রঙ্গভূমিতে সূত অধিরথের উপস্থিতিতে যখন প্রকাশ পাইল যে, কর্ণ সূতপুত্র এবং ভীম বিদ্রূপ-ভঙ্গীতে কর্ণকে ধনুক ছাড়িয়া চাবুক ধরিবার নির্দ্দেশ দিলেন, রোষাকুলিত কর্ণ সে সময় যদিও নির্ব্বাক, কিন্তু দুর্য্যোধন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া দৃঢ়স্বরে যে ভাবে প্রতিবাদ করিলেন, তাহাতে দুর্য্যোধনের সাহস ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলিলেন,—ভীম, তোমার এরূপ কথা বলা উচিত হয় নাই। ক্ষত্রিয়গণের বলই শ্রেষ্ঠ পরিচয়; বন্ধুদের সহিতও ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিতে পারেন। আর বীরগণের ও নদীসমূহের উৎপত্তির ক্ষেত্র নির্ণয় দুষ্কর। এই সহজাত-কুণ্ডল-কবচযুক্ত সর্ব্বসুলক্ষণলক্ষিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী পুরুষসিংহ কর্ণকে দেখিয়া মনে হয় কি ইনি হরিণীর গর্ভ হইতে

উৎপন্ন হইয়াছেন? কর্ণ এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন, ইনি রাজা। আমার এ কার্য্য যাহাদের সহ্য হয় নাই, তাহারা যুদ্ধের জন্য ধনু আকর্ষণ করুক।

দুর্য্যোধনের একথার উত্তরে ভীমের মুখ বন্ধ হইয়া যায় এবং এইদিন হইতেই নিয়তির নির্দ্দেশে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দেন এই কর্ণ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোধনের অন্তরে কূটবুদ্ধি বদ্ধমূল হইয়া তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের উচ্ছেদে প্রমত্ত করিয়া তুলিল। যুধিষ্ঠির যখন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, দুর্য্যোধনের বিদ্বেষ তখন চরমে উঠিল। কাহার কোথায় দুর্ব্বলতা, দুর্য্যোধন তাহা ভাল ভাবেই বুঝিতেন। ধৃতরাষ্ট্রকে যখন তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত যুধিষ্ঠিরকে পরিজনগণ রাজ্যাভিষিক্ত করিতে উৎসুক এবং যুধিষ্ঠির রাজা হইলে তাঁহার বংশধরগণই যথাক্রমে রাজা হইবেন, আর কৌরবগণ দূরে দাঁড়াইয়া তাহা দর্শন করিবেন মাত্র; তখন বৃদ্ধের চিত্তও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ইহার পরই কণিকের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণা এবং ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা পাণ্ডবগণকে বারণাবতে পাঠাইয়া বিনাশ করিবার পৈশাচিক ব্যবস্থা। এই শোচনীয় ষড়্‌যন্ত্রের সহিত দুর্য্যোধনের সংযোগ থাকিলেও এমন কৌশলে সতর্কতার সহিত তিনি ইহার কলকাঠি টিপিতেছিলেন যে, তাঁহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোন উপায় ছিল না।

কালক্রমে যখন প্রকাশ পাইল পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন এবং দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া তাঁহারা পাঞ্চালগণকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে বল-প্রয়োগে নির্জ্জিত করিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণা ও পাঞ্চাল মধ্যে অনৈক্যের ব্যবধান সৃষ্টি করিতে

চান ; অথবা সুকৌশলে তাঁহাদিগকে বিনাশ করা হয় ইহাই তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায়। এই প্রস্তাব ধৃতরাষ্ট্র এবার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি পাণ্ডবগণকে সাদরে আনাইয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান-পূর্ব্বক খাণ্ডব-প্রস্থে পাঠাইয়া দিলেন।

পাণ্ডবগণের বিপুল উদ্যমে ও শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় খাণ্ডব-প্রস্থ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে পরিণত হইয়া সকলের বিস্ময় সৃষ্টি করিল এবং দিগ্বিজয় পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, তখন দুর্য্যোধন নীরবেই পাণ্ডবগণের পরাক্রম ও বিপুল প্রতিষ্ঠা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পাণ্ডবগণের সৌভাগ্যোন্নতির এই প্রবল প্লাবনে তিনি কোনরূপ প্রতিবাদ বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টিও করেন নাই ; বরং পাণ্ডবগণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আত্মীয়োচিত নিষ্ঠার সহিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে যোগদান ও ভারপ্রাপ্ত কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদন করিয়াছিলেন। এমন কি, যজ্ঞান্তে কৃষ্ণপ্রমুখ বান্ধববৃন্দ বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেও, দুর্য্যোধন মাতুল শকুনির সহিত কিছুদিন পাণ্ডব ভবনে রহিয়া গেলেন।

দানবশিল্পী ময়ের পরিকল্পনায় ইন্দ্রপ্রস্থের যে প্রাসাদ ও সভাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, মাতুল শকুনির সহিত তাহা পরিদর্শন করিতে গিয়া দুর্য্যোধনকে অতিশয় অপ্রস্তুত হইতে হইল। কোন এক গৃহের স্ফটিকময় কুট্টিমে স্ফটিকনির্ম্মিত প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখিয়া জলভ্রমে তথায় অতি সন্তর্পণে পদবিক্ষেপ করিতে গিয়া তিনি আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। চারিদিকে উচ্চ হাস্যের রোল উঠিল। ইহার পর কক্ষের স্ফটিকময় ভিত্তিকে দ্বার ভ্রম করিয়া সেই পথে বাহির হইতে গিয়া মস্তকে কঠিন আঘাত পাইলেন। সহদেব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। আর এক সময় কৃত্রিম সরোবরের স্বচ্ছ জলকে স্ফটিক ভাবিয়া তাহা লঙ্ঘন করিতে গিয়া সবস্ত্র জলমধ্যে পড়িয়া গেলেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ কিঙ্করগণ

উত্তমোত্তম বস্ত্র আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। এ অবস্থায় যুধিষ্ঠির স্থির থাকিলেও, অর্জ্জুন নকুল সহদেব কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না; এমন কি অলিন্দ হইতে সহচরীবৃন্দ-পরিবৃত দ্রৌপদীও হাসিয়া ফেলিলেন। ফলে এই হাসি মহামানী দুর্য্যোধনের চিত্তে যে জ্বালার সৃষ্টি করিল, তাহাতে অতিষ্ঠ হইয়াই তিনি হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের অতুল ঐশ্বর্য্যের শোভার সহিত দ্রৌপদীসহ ভীমাদির ব্যঙ্গহাসি তাঁহাকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিল যে, শকুনির নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া তিনি কহিলেন,—হে মাতুল! যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া এবং পাণ্ডবদের উপহাস শুনিয়া আমি একান্ত পরিতপ্ত হইয়াছি! তুমি আমাকে প্রাণত্যাগের অনুজ্ঞা দিয়া পিতাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিও।

কিন্তু শকুনি যখন পাণ্ডবদিগের সমগ্র ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ ও হতশ্রী করিবার অপূর্ব্ব উপায় দুর্য্যোধনকে শুনাইয়া দিলেন, তখন প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প তাঁহার জলবুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া গেল এবং হৃতসর্ব্বস্ব পাণ্ডবদের শোচনীয় দুর্গতি ও তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা মনে মনে কল্পনা করিয়া তিনি আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন। ইহার পর ইন্দ্রপ্রস্থের মর্ম্মবিদারী সেই লাঞ্ছনার বিষয় নিবেদন করিয়া পিতার স্নেহপ্রবল অন্তরকে সঙ্কল্পের অনুকূলে আকৃষ্ট করিতে তাঁহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

দ্যূতসভায় বিজিত পাণ্ডব ও কুলবধূ দ্রৌপদীর প্রতি দুর্য্যোধন যেরূপ কঠোর ও নিষ্ঠুর হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়োচিত উদারতা ও সহৃদয়তা বর্জ্জন করিয়া যেরূপ বর্ব্বর মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার মূলে ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানবনির্ম্মিত স্ফটিকময় সভাগৃহে লাঞ্ছনা, সানুচর পাণ্ডবগণের এবং তাঁহাদের সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর উপহাস যেন প্রচ্ছন্ন

ছিল বলিয়া মনে হয়। মহাভারতে দুর্য্যোধনের চরিত্রগত আচরণ ও মনোবৃত্তির যে সকল পরিচয় আমরা পাই, তাহাতে বেশ বুঝা যায়, তিনি মার্জ্জিতরুচি, কর্ত্তব্যকঠোর, তেজস্বী, স্পষ্টবক্তা, সাহসী, আড়ম্বর-প্রিয়, দাম্ভিক ও শস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। রামায়ণের রাবণের ন্যায় দুর্য্যোধন যে পরস্ত্রী-লোলুপ বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামুক ছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই। পরনারী সম্পর্কে একমাত্র দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর প্রতি তাঁহার দুর্ব্যবহার বা অশিষ্টতার নিদর্শনে আমাদের অন্তর তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠে। ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় সর্ব্বসমক্ষে উপহসিত হইলে এবং দ্রৌপদী তাহার অংশ গ্রহণ করিলেও, কুলবধুর প্রতি দুর্য্যোধনের ন্যায় দৃঢ়চেতা নির্ভীক রাজ-গুণসম্পন্ন বলিষ্ঠ ব্যক্তির এই অশিষ্টাচার যে অতিশয় মর্ম্মপীড়াদায়ক এবং ক্ষমার অযোগ্য, সে বিষয়ে মতভেদ নাই। দ্রৌপদীকে দ্যূতসভায় আনিবার আদেশ এবং তদনুসারে দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে সভায় লইয়া আসিলে, তাঁহার উদ্দেশে দুর্য্যোধনের পরিহাস এবং বস্ত্র উত্তোলনপূর্ব্বক স্বীয় বাম উরু প্রদর্শন—দুর্য্যোধনচরিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও কলঙ্কময় অধ্যায়।

দ্বিতীয়বার দূতক্রীড়া অনুষ্ঠিত ও তাহাতে পরাস্ত হইয়া পাণ্ডবগণ বনবাসী হইলে দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের রাজত্ব দ্রোণাচার্য্য, কর্ণ ও শকুনিকে বিভাগ করিয়া দিলেন। অবশ্য কুরুরাজ দুর্য্যোধনই সেই রাজত্বের সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

দুর্য্যোধন যেমন দাম্ভিক ও দৃঢ়চেতা, তেমনই অসাধারণ উদ্যোগী পুরুষ। যোদ্ধা ও রাজন্যবর্গকে আজ্ঞাধীন ও বাধ্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই সিদ্ধহস্ত। এমন কি, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য পর্য্যন্ত তাঁহাকে অধর্ম্মাচারী ও দুর্নীতি-পরায়ণ জানিয়াও রাজগুণসম্পন্ন দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, বীরপুরুষগণের

সম্মান রক্ষা করিতে দুর্যোধন বিশেষভাবে অভ্যস্ত। এই জন্যই তিনি পাণ্ডবদিগের ন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও অনায়াসে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের মাতুল মদ্রাধিপতি শল্য পর্যন্ত দুর্যোধনের শিষ্টাচারপূর্ণ আচরণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

উপযুক্ত সুযোগ ও সময়ের সাহায্য লইয়া সর্ব্বাগ্রে কার্যোদ্ধার করিতে দুর্য্যোধনের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য গ্রহণ তিনি আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণকে তিনি মনে মনে ঘৃণাও করিতেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাহার্য্যপ্রার্থী হইতেও দ্বিধা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, একদিকে তিনি নিরস্ত্র একাকী এবং অন্যদিকে তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সশস্ত্র এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা—দুর্য্যোধন কাহাকে চান? শক্তিমান্ দুর্য্যোধন নিরস্ত্র শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া সশস্ত্র এক অক্ষৌহিণী সেনার গুরুত্বই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি কোন দিন অতিমানুষ বা ঐশীশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ বলিয়া ধারণা করেন নাই। সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় আসিতেছেন শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র যখন ধনরত্নাদির দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিবার প্রস্তাব করেন, দুর্য্যোধন তাহার প্রতিবাদে বলেন যে, 'ইহা উচিত নহে, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিবেন যে, আমরা ভীত হইয়াছি।' শ্রীকৃষ্ণ যেমন স্থির বুঝিয়াছিলেন, সন্ধি হইবে না এবং সন্ধি হওয়াটাও তাঁহার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা ছিল না; দুর্য্যোধনও তেমনই জানিতেন যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য, সন্ধি হইবে না। যে শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে সৈন্যসাহায্য করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন কার্য্যসিদ্ধির অনুরোধে সেই কৃষ্ণকেই বন্দী করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। পরন্তু পরবর্ত্তী কার্য্যপদ্ধতি হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই উক্ত প্রস্তাব

কার্য্যে পরিণত করিতে দুর্য্যোধনকে বাধ্য করিয়াছিলেন। সন্ধি স্থাপন করিতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের উচিত কথাগুলির তীক্ষ্ণতা দুর্য্যোধন সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি সভাস্থলে বসিয়া সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের বক্তৃতা ক্রমশঃই সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার ফলে তাঁহার পক্ষীয় বীরগণের হৃদয়ও পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইতেছে। এ অবস্থায় সভামধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিবার জন্যই তিনি সভা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া যান। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন কুরুবৃদ্ধগণকে উত্তেজিত করিয়া দুর্য্যোধনকে বন্ধনপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের হস্তে প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন, তখন চরমুখে দুর্য্যোধন তাহা জ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকেই বন্ধন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও রণদক্ষ বীরগণকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া কৌরবসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। সভামুখে তাঁহার প্রবল সেনাবল প্রস্তুত ছিল। দুর্য্যোধনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল যে, সভা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ সদলবলে হস্তিনা ত্যাগ করেন। এইরূপ বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এই সভায় শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তাবের উত্তরে দুর্য্যোধন দৃঢ়তার সহিত যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার কূট রাজনীতিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট। ফলতঃ কূট বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণও দুর্য্যোধনকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সভায় তাঁহার উদ্দেশ্য দুর্য্যোধনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ব্যর্থ হওয়ায় দুর্য্যোধনের অসাক্ষাতে পরে তিনি কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষভুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে স্পষ্টভাবেই জানাইলেন,—হে কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম; সে সময় ভ্রম বশতঃই হউক বা ভয় প্রযুক্তই হউক, পাণ্ডবগণকে আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল। এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে

পরিমাণে ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায় বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।

শেষ পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের এই দুর্জ্জয় পণ কেহই ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। যে শ্রীকৃষ্ণ একদিন অর্জ্জুনকে তাঁহার শাশ্বত বাণী শুনাইয়াছিলেন, —'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' তাঁহার উদ্দেশেই দুর্য্যোধন সন্ধি সম্পর্কে দৃঢ়স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন,—আমরা স্বধর্ম্মে উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক যদি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিব। সংগ্রামে শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম, আমরা এই শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইব না।

নীতির দিক্ দিয়া যত অন্যায়ানুষ্ঠানেই ইনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, ইঁহার এই বীরবাণীরও সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। যে বাক্য সভামধ্যে দুর্য্যোধন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কদাচ তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ একে একে নিহত হইলেও এই স্বাবলম্বী দৃঢ়সংকল্প মহাপুরুষ তাঁহার অবলম্বিত স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। কর্ণের পতনের পর মহানুভব যুধিষ্ঠির সন্ধির প্রস্তাব করিয়াও দুর্য্যোধনকে অবনমিত করিতে পারেন নাই। জ্ঞাতিদ্রোহ, স্বার্থপরতা, অসূয়াপারবশ্য, কূটবুদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ দোষের আধার হইলেও বিধাতা এই অসাধারণ পুরুষসিংহকে এমন কতকগুলি নরদুর্ল্লভ গুণগ্রামে বিভূষিত করিয়াছিলেন যে, উগ্র অথচ গৌরবযুক্ত রাজনীতিজ্ঞানসম্পন্ন শক্তিশালী সম্রাটের পক্ষেই সে গুণগুলি একান্ত উপযুক্ত। ন্যায়নিষ্ঠ দূরদর্শী বিচক্ষণ নৃপতি যুধিষ্ঠির তাঁহার পরম প্রতিদ্বন্দ্বীর এই গুণগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

———*———

অর্জ্জুন

শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে অর্জ্জুন যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, কুন্তী তখন নবজাত সন্তান সম্বন্ধে এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন—

কার্ত্তবীর্য্যসমঃ কুন্তি শিবিতুল্যপরাক্রমঃ।
এষ শক্র ইবাজেয়ো যশস্তে প্রথয়িষ্যতি ॥
অদিত্যা বিষ্ণুনা প্রীতির্যথাভূদভিবর্দ্ধিতা।
তথা বিষ্ণুসমঃ প্রীতিং বর্দ্ধয়িষ্যতি তেঽর্জ্জুনঃ ॥
এষ মদ্রান্ বশে কৃত্বা কুরূংশ্চ সহ সোমকৈঃ।
চেদিকাশিকরূষাংশ্চ কুরুলক্ষ্মীং বহিষ্যতি ॥

আ-প ১২৩।৩৫—৩৭।

অর্থাৎ—কার্ত্তবীর্য্যসদৃশ বীর্য্যবান্, শিবিতুল পরাক্রমশালী, পুরন্দর সদৃশ অজেয় এই পুত্র তোমার সর্ব্বত্র যশোরাশি বিস্তীর্ণ করিবেন। উপেন্দ্র হইতে যেমন অদিতির প্রীতিবর্দ্ধন হইয়াছিল, সেইরূপ উপেন্দ্র সদৃশ এই পুত্র তোমার সমধিক প্রীতিবর্দ্ধন করিবেন। এই কুমার মদ্র, কুরু, সোমক, চেদি, কাশি, করূষ প্রভৃতি দেশসমূহ জয় করিয়া কুরুবংশের রাজলক্ষ্মীর মহিমা বর্দ্ধন করিবেন।

কিশোর বয়সে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষাকালে অর্জ্জুনের

অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভার খ্যাতি শুনিয়া জননী কুন্তীর মনে অর্জ্জুনের জন্মকালের আকাশবাণী জাগরূক হইয়া উঠিত। স্বয়ং আচার্য্য দ্রোণও তাঁহার গুণে মুগ্ধ ছিলেন। এই সময় যে কয়টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্জ্জুন আচার্য্যের নিকট বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হন, অর্জ্জুনের চরিত্রালোচনায় সেগুলি অপরিহার্য্য।

দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিক্ষা গ্রহণের প্রাক্কালে আমরা বালক অর্জ্জুনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রথম পরিচয় পাই। আচার্য্যকে হস্তিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ভীষ্মদেব কুরুবালকগণকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বালকগণও শ্রদ্ধা সহকারে আচার্য্য দ্রোণের চরণ বন্দনা করিলে, তিনি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাদিগকে অন্তেবাসী বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক কহিলেন,—হে শিষ্যগণ! আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিব। তোমরাও অঙ্গীকার কর যে, শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে আমার একটি অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধ করিবে?

মহাভারতের কথায় এ সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে—

তচ্ছ্রুত্বা কৌরবেয়াস্তে তূষ্ণীমাসন্ বিশাম্পতে।
অর্জ্জুনস্তু ততঃ সর্ব্বং প্রতিজজ্ঞে পরন্তপ ॥

আ-প, ১৩৪-৭

অর্থাৎ—আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া সকলেই মৌন রহিলেন, কেবল অর্জ্জুন উৎসাহ সহকারে গুরুবাক্য স্বীকার করিলেন।

শিক্ষার প্রারম্ভে গুরুসমীপে সাহস সহকারে এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় গুরু আনন্দে অভিভূত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। প্রতিভাশালী শিষ্য গুরুকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, বিচক্ষণ গুরুও উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া এতই প্রীত হন যে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারায় আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে। তিনি উপলব্ধি

করিলেন যে, তাঁহার অভিলষিত কার্য্য এই বালকই একদা সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।

দ্রোণ যেমন অনন্যসাধারণ গুরু এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাও তাঁহার অপূর্ব্ব; অর্জ্জুনও তেমনই অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন শিষ্য—শিক্ষার আগ্রহ তাঁহার অসাধারণ।

দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও কুরুবালকগণের সঙ্গে শস্ত্র শিক্ষা করিতেন; কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহাকেও অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, পুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে দ্রোণ প্রতিদিন শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে অন্যান্য শিষ্যগণকে ক্ষুদ্রমুখ কমণ্ডলুতে নদী হইতে জল ভরিয়া আনিতে বলিতেন, কেবল অশ্বত্থামাকে এক বিস্তীর্ণমুখ কলসী দিতেন—যাহাতে অশ্বত্থামা অন্যের অপেক্ষা শীঘ্র প্রত্যাগত হইয়া গোপনে কিছু বিশেষ শিক্ষালাভ করিতে পারেন। অর্জ্জুন গুরুর এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বরুণাস্ত্র দ্বারা কমণ্ডলু জলে পরিপূর্ণ করিয়া অশ্বত্থামার সহিত এক সময়েই গুরুর নিকট উপস্থিত হইতেন। এই নিমিত্ত তিনি কোন অংশে গুরুপুত্র অপেক্ষা অল্প শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই।

আর একদিন রাত্রিতে অর্জ্জুন ভোজন করিতেছেন, এমন সময় সহসা প্রবল বায়ুতে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। অর্জ্জুন অন্ধকারেই আহার সমাধা করিয়া পরে চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কিছু দেখিতে না পাওয়া সত্ত্বেও অভ্যাসবশতঃ হস্ত অন্ন ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পড়িল না, এবং হস্তও তাহা মুখাগ্র ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তুলিয়া দিল না। ইহাতে অভ্যাসের মাহাত্ম্য সম্যকরূপে বুঝিয়া অর্জ্জুন অন্ধকার রাত্রিতে না দেখিয়া লক্ষ্যের প্রতি বাণক্ষেপ করা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। ফলে গভীর নিশীথে ধনুষ্টঙ্কার শ্রবণ করিয়া দ্রোণাচার্য্য এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং শিক্ষাবিষয়ে অর্জ্জুনের অসামান্য অভিনিবেশ ও উৎসাহ দেখিয়া

তাঁহাকে কহিলেন,—বৎস! তুমি যাহাতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হও, আমি সে বিষয়ে যত্নবান্ হইব।

লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় অর্জ্জুনের একাগ্রতার প্রসঙ্গটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদিন দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ একটি কৃত্রিম নীলবর্ণ পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা বৃক্ষের অগ্রশাখায় স্থাপন করিলেন। পরে শিষ্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন,—তোমরা সকলে ঐ পক্ষিদেহে লক্ষ্যভেদ করিতে প্রস্তুত থাক। আমি একে একে তোমাদিগকে নিয়োগ করিব। আদেশ পাইবামাত্র তোমরা তীক্ষ্ণ শরদ্বারা পক্ষীর শিরশ্ছেদ করিবে।

রাজকুমারগণ ধনুকে শর যোজনা করিয়া আচার্য্যের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্যের দিকে স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—তুমি ঐ পক্ষীকে দেখিতেছ?

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন,—হাঁ, দেখিতেছি।

পুনরায় আচার্য্য প্রশ্ন করিলেন,—তুমি আর কি দেখিতেছ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—আমি ঐ বৃক্ষকে, আপনাকে ও এখানে উপস্থিত সকলকেই দেখিতেছি।

যুধিষ্ঠিরের মুখে এইরূপ উত্তর শুনিয়া দ্রোণের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল; তিনি কহিলেন,—তুমি এই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে না। নিজের স্থানে চলিয়া যাও।

অনন্তর দুর্য্যোধন, ভীম প্রভৃতি অন্যান্য রাজকুমারগণকে পর্য্যায়ক্রমে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদের মুখেও অনুরূপ উত্তর শুনিয়া দ্রোণ বিরক্তি-ভরে প্রত্যেককেই বিদায় করিয়া দিলেন, কেহই লক্ষ্যভেদের অনুমতি পাইলেন না।

সর্ব্বশেষে ডাক পড়িল অর্জ্জুনের। তাঁহাকে লক্ষ্যের দিকে স্থাপন-

পূর্ব্বক তিনি প্রশ্ন করিলেন,—তুমিও নিশ্চয়ই ঐ বৃক্ষ, বৃক্ষস্থ পক্ষী, আমাকে এবং তোমার ভ্রাতৃগণকে লক্ষ্য করিতেছ ?

অর্জ্জুন উত্তর দিলেন,—আমার দৃষ্টি কেবল আমার লক্ষ্যের প্রতিই নিবদ্ধ। আমি বৃক্ষকে বা আপনাদিগকে কাহাকেও দেখিতেছি না।

এরূপ উত্তর শুনিয়া দ্রোণের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি প্রীতমনে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কি পক্ষীটির সমগ্র অঙ্গই দেখিতেছ ?

অর্জ্জুন কহিলেন,—না, আমি কেবলমাত্র পক্ষীর মস্তকটুকু দেখিতেছি।

দ্রোণ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—তুমি লক্ষ্য ভেদ কর।

অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ বাণত্যাগ করিলেন এবং পক্ষীর ছিন্ন মস্তক ভূতলে পতিত হইল।

আর একদিন শিষ্যগণকে লইয়া দ্রোণ গঙ্গায় স্নান করিতে গেলেন। তিনি জলে অবগাহন করিতেই এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহাকে ধরিল ও গভীর জলে টানিয়া লইয়া চলিল। দ্রোণের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ অনায়াসেই কুম্ভীরকবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু সে চেষ্টা না করিয়া তিনি পরিত্রাণের নিমিত্ত শিষ্যগণকে আহ্বান করিলেন। অন্যান্য শিষ্যগন এ বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ এমন কৌশলে ক্ষিপ্রহস্তে কুম্ভীরের মর্ম্মস্থল শরবিদ্ধ করিলেন যে, দ্রোণকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ সে পলায়নপর হইল।

এইরূপ প্রত্যুৎপন্নমতি ও বাণপ্রয়োগ-কৌশলী শিষ্যের কৃতিত্বে দ্রোণ আনন্দে অভিভূত হইলেন। মনে মনে তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, অর্জ্জুনের সাহায্যেই একদিন তাঁহার মনোরথ সিদ্ধি হইবে। চতুর অর্জ্জুনও আচার্য্যের তুষ্টি সাধনে সর্ব্বদাই তৎপর থাকিতেন। ইহার ফলে, শিক্ষাকালেই তিনি আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মশিরা নামক এক দিব্য অস্ত্র লাভ করিতে সমর্থ হন। অস্ত্রদান কালে আচার্য্য অর্জ্জুনকে এই বলিয়া সতর্ক

করিয়া দেন যে, মানুষ-প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে কদাচ ইহা প্রয়োগ করিও না। যদি কোন অমানুষ শত্রু তোমাকে আক্রমণ করে, তাহার সংহারার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে।

দ্রোণপ্রদত্ত এই দিব্য অস্ত্র প্রভাবেই অর্জ্জুন অমানুষ মহাযোদ্ধা পরম মায়াবী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথকে পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।

রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কৃতবিদ্য শিষ্যগণের নিকট দ্রোণাচার্য্য অভিলষিত গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বেই অর্জ্জুন এ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এক্ষণে শিষ্যগণ সকলেই গুরুদক্ষিণা প্রদানে উৎসাহিত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য শিষ্যদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন,—হে শিষ্যগণ! তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আমার নিকট আনয়ন কর। ইহাই তোমাদের নিকট প্রাপ্য গুরুদক্ষিণা স্বরূপ গণ্য করিব।

গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজকুমারগণ পরমোৎসাহে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু গুরুদেবের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন অর্জ্জুন। তিনি দ্বৈরথ যুদ্ধে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া আচার্য্যের নিকট দক্ষিণা স্বরূপ অর্পণ করিলেন।

ইহার পর অর্জ্জুনের শৌর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত তুমুল সংঘর্ষের সময়। বারণাবতের চক্রান্ত হইতে কোন রকমে নিষ্কৃতি পাইয়া পাণ্ডবগণ জননী কুন্তীর সহিত তখন ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করিতেছিলেন। ঘটনাচক্রে এই সময় তাঁহারা ভাগীরথীতীরবর্ত্তী এক মনোহর তীর্থে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন

হওয়ায় অর্জ্জুন একটি প্রজ্বলিত মশাল হস্তে সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছিলেন। তখন দুর্দ্ধর্ষ গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া গঙ্গাবক্ষে জলক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন। পাণ্ডবদিগের উপস্থিতিতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্রবর্ত্তী অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। এই গন্ধর্ব্বরাজ পরম মায়াবী ও মহাবল পরাক্রান্ত বলিয়া বিদিত। কিন্তু তিনি রথারোহণে মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিতেই অর্জ্জুন দ্রোণদত্ত ব্রহ্মশিরা নামক মহাস্ত্র তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিলেন। এই অস্ত্র অর্জ্জুনকে দান করিবার সময় আচার্য্য ইহার প্রয়োগক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। গুরুদত্ত অস্ত্রের প্রভাবে গন্ধর্ব্বরাজের মায়াজাল ছিন্ন হইয়া গেল এবং তিনি স্বয়ং রথভ্রষ্ট হইয়া ভূপতিত ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। কিন্তু গন্ধর্ব্বরাজ-পত্নী স্বামীর প্রাণরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইলে তিনি কৃপাপরবশ হইয়া অর্জ্জুনকে নিবারণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বরাজকে মুক্তি দিলেন।

অতঃপর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত অর্জ্জুনের সৌখ্য স্থাপিত হইল। এবং এই সৌখ্যসূত্রে চিত্ররথ অর্জ্জুনকে তাঁহার মায়া বিদ্যা ও মনের ন্যায় বেগগামী বহুসংখ্যক গান্ধর্ব্ব অশ্ব প্রদান করিতে চাহিলেন। অর্জ্জুন বলিলেন, 'অশ্বগুলি এখন তোমার নিকট থাক, প্রয়োজন হইলে গ্রহণ করিব।' কিন্তু ইহার বিনিময়ে গন্ধর্ব্বরাজ যখন অর্জ্জুনের নিকট পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন, অর্জ্জুন তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তৎক্ষনাৎ পূর্ণ করিলেন।

অর্জ্জুনের এই বদান্যতায় প্রীত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ তৎক্ষণাৎ পাণ্ডবদিগের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিলেন; এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গন্ধর্ব্বপতির নির্দ্দেশেই তাঁহারা উৎকোচ তীর্থে গমনপূর্ব্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন এবং সেইসূত্রে পাঞ্চাল নগরে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় তাঁহাদিগের যোগদানের সুযোগ-উপস্থিত হইল।

স্বয়ম্বরসভায় অর্জ্জুন অনন্যসাধারণ শক্তির প্রভাবে লক্ষ্যভেদ করিলেন। যে দ্রৌপদীর জন্য রাজন্য সমাজ উন্মত্ত, অর্জ্জুনের চিত্তে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু মাত্র চাঞ্চল্য নাই। কৃষ্ণাকে লইয়া পঞ্চ ভ্রাতা যখন কুম্ভকারভবনে উপনীত হইলেন এবং গৃহমধ্য হইতে জননী ভিক্ষালব্ধনিধি সকলে মিলিয়া ভোগ করিবার নির্দ্দেশ দিলেন, তখনও অর্জ্জুন অবিচলিত, তাঁহার মুখে ক্ষোভের চিহ্নটিও নাই।

যুধিষ্ঠির যখন বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! দ্রৌপদী তোমারই জয়লব্ধধন, অতএব তুমিই যথারীতি ইঁহার পাণিগ্রহণ কর।—অর্জ্জুন তখন জ্যেষ্ঠের উদ্দেশে প্রতিবাদের সুরে কহিলেন,

মা মাং নরেন্দ্র ত্বমধর্ম্মভাজং কৃথা ন ধর্ম্মোঽয়মশিষ্টদৃষ্টঃ।
ভবান্নিবেশ্যঃ প্রথমং ততোঽয়ং ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্ম্মা॥
অহং ততো নকুলোঽনন্তরং মে পশ্চাদয়ং সহদেবস্তরস্বী।
বৃকোদরোঽহঞ্চ যমৌ চ রাজন্নিয়ঞ্চ কন্যা ভবতো নিযোজ্যাঃ॥
এবং গতে যৎ করণীয়মত্র ধর্ম্ম্যং যশস্যং কুরু তদ্বিচিন্ত্য।
পাঞ্চালরাজস্য হিতঞ্চ যৎ স্যাৎ প্রশাধি সর্ব্বে স্ম বশে স্থিতাস্তে॥

আঃ পঃ ১৯১।১০

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! আপনি আমাকে অধর্ম্মভাগী করিবেন না। যাহা আজ্ঞা করিতেছেন ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা অশিষ্ট-দৃষ্ট পথ। প্রথমে আপনার, পরে অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবাহু ভীমসেনের, তৎপরে আমার, তাহার পর আমার অনন্তরজাত নকুলের এবং সর্ব্বশেষে তরস্বী সহদেবের বিবাহ হওয়াই বিধেয়। এক্ষণে ভীমসেন, নকুল, সহদেব, এই কন্যা এবং আমি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতেছি; ইহাতে যাহা ধর্ম্ম যশস্করূপে কর্ত্তব্য হয় এবং যাহাতে পাঞ্চালরাজের হিতানুষ্ঠান হইতে পারে, ইহা বিবেচনা

পূর্ব্বক আপনি আজ্ঞা করুন, আমাদের মধ্যে কেহই আপনার আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব না।

অর্জ্জুনের এই উক্তি অনুসারেই যুধিষ্ঠির নির্দ্দেশ দেন যে দ্রৌপদী তাঁহাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন।

অতঃপর দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া পঞ্চপাণ্ডব খাণ্ডবপ্রস্থে প্রতিষ্ঠিত হইলে দ্রৌপদীসম্পর্কে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নিবারণ কল্পে তাঁহারা এইরূপ নিয়মবদ্ধ হন যে, দ্রৌপদী যখন কোন এক ভ্রাতার সঙ্গে থাকিবেন, অন্য কোন ভ্রাতা যে সময় সে স্থানে গমন করিবেন না। এই নিয়ম যিনি লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরকাল বনবাস করিতে হইবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে এই নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য অর্জ্জুনকেই এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতে হইল। একদা অস্ত্রাগারে যখন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, কোন ব্রাহ্মণের গোধনহরণকারী দস্যুদলকে দমনের জন্য অর্জ্জুনকে অস্ত্রানুসন্ধানে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে হয়। অতঃপর দস্যু দমনের পর প্রত্যাবৃত্ত অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আর্য্য! দ্রৌপদীর সহিত আয়ুধাগারে আপনার অবস্থানকালে আমি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়মভঙ্গ করিয়াছি; অতএব আমাকে ইহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য বনগমনের অনুমতি দান করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—কর্ত্তব্যের অনুরোধে তুমি ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে নিয়মভঙ্গজনিত দোষ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বিশেষতঃ, সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে জ্যেষ্ঠের প্রবেশ অবৈধ, কিন্তু সস্ত্রীক জ্যেষ্ঠের গৃহে কনিষ্ঠের প্রবেশ দোষাবহ নহে।

কিন্তু জ্যেষ্ঠের এই যুক্তি অর্জ্জুনের অন্তর স্পর্শ করিল না। তিনি ইহাতে নিবৃত্ত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, আপনিই বলিয়া

থাকেন যে, ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত নহে, সুতরাং আমার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া সত্যভঙ্গের নিমিত্ত আমাকে প্ররোচিত করিবেন না। সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে এই দৃঢ়তা অর্জ্জুনের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ কর্ম্মজীবনের নানা অংশেই প্রতীয়মান হয়।

এই দ্বাদশবর্ষব্যাপী বনভ্রমণ ও নানা দেশ পর্য্যটনের মধ্যে অর্জ্জুন নাগরাজকন্যা উলুপী, মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা এবং যাদবদুহিতা শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করেন। দ্বাদশ বর্ষান্তে অর্জ্জুন সুভদ্রার সহিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, যাদবগণের সহিত পাণ্ডবগণের এই অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তা বন্ধন কৌরবগণের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠে।

ইহার পরেই খাণ্ডবদাহনপূর্ব্বক ময়দানবের সহায়তায় ইন্দ্রপ্রস্থের রচনা ও প্রতিষ্ঠা। প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকেই এ কার্য্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে হয়। রাজসূয় যজ্ঞের প্রাক্কালে অর্জ্জুন উত্তর দিকে সসৈন্য অভিযানপূর্ব্বক কাশ্মীর ও হিমাচল প্রদেশান্তর্গত বহু রাজ্য জয় করেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি অর্জ্জুনের গভীর অনুরক্তি রামানুজ লক্ষ্মণের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্ব্বস্ব যুধিষ্ঠিরের বালকোচিত আচরণেও অর্জ্জুন নির্ব্বিকার। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির যখন দ্রৌপদীকে অম্লান বদনে পণ রাখিয়া বসিলেন, তখন ধৈর্য্যচ্যুত ভীম তাঁহাকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে তিরস্কার করিতে থাকিলে অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠের পক্ষ সমর্থন করিয়া ভীমকে কহিলেন,—হে আর্য্য! আজ তোমার এরূপ মতিভ্রম হইল কেন? মনের আবেগে শত্রুগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষত্রধর্ম্মানুসারেই ক্রীড়া করিয়াছেন, ক্ষত্রধর্ম্মানুসারেই অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উদ্দেশে ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা কিছুতেই উচিত নহে।

অতুল সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসকালেও অর্জ্জুনের তিতিক্ষা ও শিক্ষানুরক্তি কি চমকপ্রদ! অনায়ত্ত দুর্লভ অস্ত্রাদি প্রাপ্তির জন্য তিনি চলিলেন দুর্গম হিমাচল প্রদেশে কঠোর সাধনায়। সে সাধনায় সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। প্রাপ্ত অস্ত্রের সহায়তায় দেবতাদের পরম শত্রু হিরণ্যপুরনিবাসী নিবাত ও কবচ নামক দুইটি দুর্দ্ধর্ষ দানবকে সংহার করিয়া তিনি দেবতাদিগকে চমৎকৃত করিলেন। স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অপ্সরী উর্ব্বশী আসিলেন পরিচর্য্যায় অর্জ্জুনকে আপ্যায়িত করিতে। যাহার অভূত-পূর্ব্ব রূপের প্লাবনে তপঃসিদ্ধ কত সিদ্ধর্ষির কঠোর সংযম ভাসিয়া গিয়াছে, যে রূপসীর ক্ষণিক প্রসন্নতা লাভের জন্য দেববৃন্দ লালায়িত,অর্জ্জুন তাহাকে সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করিয়া মর্ত্তমানবের মহা মহত্ত্ব ঘোষণা করিলেন।

হৃতসর্ব্বস্ব বনবাসী পাণ্ডবগণকে হস্তিনার অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে আসিয়া দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বগন কর্ত্তৃক পরাস্ত ও সপরিবার ধৃত হইলে, জ্যেষ্ঠের আদেশে অর্জ্জুন তাঁহাকে উদ্ধার করিতে বাধ্য হন। ইহার ফলে পরম বন্ধু গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের বিরুদ্ধেই পুনরায় তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হয়। পরম অনিষ্টকারী বিপন্ন শত্রুর প্রতি সদাশয় পাণ্ডবগণের এরূপ সহানুভূতিশীল উদার মনোবৃত্তি দেখিয়া গন্ধর্ব্বরাজকেও চমৎকৃত হইতে হয়।

অজ্ঞাত-বাসকালে বৃহন্নলারূপে আশ্রয়দাতার চরম বিপদে অর্জ্জুন নৃত্যশালা মধ্যে স্থির থাকিতে পারেন নাই। অজ্ঞাত-বাসের সময় উত্তীর্ণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও ক্ষত্রসুলভ কর্ত্তব্যের প্রেরণা তাঁহাকে যুদ্ধার্থী করিয়া তুলে এবং বিরাটপুত্র উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়া পরে ভয়ার্ত্ত উত্তরের নিকট আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক ত্রিগর্ত্তসহ কৌরবগণকে পরাস্ত করিয়া যে ভাবে তিনি বিরাটের গোধন উদ্ধার করেন, তাহা অর্জ্জুনের পক্ষেই সম্ভব।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্য যেমন পাণ্ডবপক্ষের বহু বিশিষ্ট নৃপতি ও যোদ্ধাকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়া আতঙ্কের শিহরণ তুলিয়াছিলেন, একা অর্জ্জুনের হস্তেও তেমনই কৌরবপক্ষের অসংখ্য যোদ্ধাও ভূপতিত ও মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন। অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে এবং সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকেই সেই দুর্ঘটনার হেতু উপলব্ধি করিয়া অর্জ্জুন তাঁহাকে পরদিন সূর্য্যাস্ত মধ্যে বধ করিবার জন্য যে কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন এবং জয়দ্রথকে বিরাট সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যূহাবরণে রক্ষা করিতে কৌরব পক্ষ যে অভূতপূর্ব্ব আয়োজন করেন, দুর্ব্বার শক্তিতে সমস্ত অন্তরায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সুরক্ষিত জয়দ্রথকে সংহার পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞারক্ষার বিবরণ কি চমকপ্রদ !

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সর্ব্বত্রই অসাধারণ শৌর্য্যের সহিত ক্ষত্রিয়োচিত আচরণনিষ্ঠায় অর্জ্জুনকে বরাবরই অতিমাত্রায় রক্ষণশীল দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদে শোকাভিভূত হইয়া দ্রোণ যখন অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক যোগাসীন হন এবং সেই অবস্থায় ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরশ্ছেদ করেন ; সেই সময় অর্জ্জুনের প্রতিবাদ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি কঠোর তিরস্কার প্রয়োগ হইতে তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্রোণের শিরশ্ছেদে তৎপর, দূর হইতে অর্জ্জুন তাহা লক্ষ্য করিয়া এই কাপুরুষোচিত অনাচার হইতে তাঁহাকে নিরস্ত করিতে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—'আচার্য্যকে বন্দী কর ধৃষ্টদ্যুম্ন, বধ করিও না।'

কিন্তু ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন অর্জ্জুনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পিতৃঘাতী মহাশত্রুকে নিরস্ত্র ও মুহ্যমান অবস্থায় হত্যা করিলেন, তখন কৌরবগণের হাহাকারের সহিত অর্জ্জুনেরও আর্ত্তনাদ মিলিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের আকাশ প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

অর্জ্জুন জানিতেন যে, কর্ণ তাঁহার পরম প্রতিদ্বন্দ্বী এবং একদিন তাঁহাদিগকে দ্বৈরথ যুদ্ধে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইতে হইবে। অস্ত্রশিক্ষার পর দ্রোণাচার্য্যের নেতৃত্বে যে পরীক্ষার আয়োজন হয়, তাহাতে অর্জ্জুনের প্রদর্শিত শস্ত্রকৌশল সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেও, পরক্ষণে কর্ণ অনাহূত ভাবে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনের প্রদর্শিত সমস্ত কৌশলগুলি দেখাইয়া সর্ব্বসমক্ষে অর্জ্জুনকে অপ্রতিভ করিয়া দেন। কিন্তু সেই দিন হইতেই অর্জ্জুন তাঁহার এই পরম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিবার সঙ্কল্প পোষণ করিয়া শিক্ষা সম্বন্ধে কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন। উপর্য্যুপরি দুইটি ভাগ্যবিপর্য্যয় অর্জ্জুনের এই সাধনায় সিদ্ধি দান করে। প্রথম, দ্বাদশবৎসর কাল খাণ্ডবপ্রস্থ ত্যাগপূর্ব্বক বহু দেশপর্য্যটন এবং দ্বিতীয় দ্বাদশবৎসরব্যাপী বনবাস। এই সময়ে পরিপূর্ণ উদ্যমে তাঁহার কঠোর সংযম সাধনা চলিতে থাকে। কর্ণের পক্ষে এরূপ সাধনা সম্ভব হয় নাই। এইজন্যই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সপ্তদশ দিবসে কর্ণের সহিত ভীষণ দ্বৈরথ যুদ্ধে কর্ণকে বধ করা অর্জ্জুনের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের সার্ব্বভৌম রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের যে অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে অর্জ্জুন অশ্বরক্ষকরূপে পাণ্ডববিরোধী শক্তিসমূহকে পরাস্ত করিয়া যশস্বী হন।

প্রিয় সখা পরম উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন অর্জ্জুনের অসামান্য কর্ম্মশক্তির প্রতীক। দ্বারকাধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্যাধশরে আহত হইয়া মহাপ্রস্থান করেন, অর্জ্জুনের অলৌকিক শক্তিও যেন তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। শেষ জীবনে এই মহাশক্তিমান অপরাজেয় ধনুর্দ্ধরকেও লুণ্ঠনপরায়ণ অনার্য্য দস্যুদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যাদবনারীদিগকে লইয়া হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে এই অনাচার অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ নারী লুণ্ঠিতা

হইলে, লুণ্ঠনাবশিষ্ট নারীবৃন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রপৌত্র বালক বজ্রকে লইয়া তিনি হস্তিনায় উপস্থিত হন এবং ইহার পর আর তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে দেখা যায় নাই।

এই ঘটনার অব্যবহিতকাল পরেই পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান এবং হিমাচলপথে অর্জ্জুনের মৃত্যু ও কর্ম্মময় জীবনের অবসান।

—০—

কর্ণ

মহাভারতের কথায় আমরা কর্ণের যে পরিচয় পাই, তাহা এইরূপ—

কন্যগর্ভঃ পৃথুযশাঃ পৃথায়াঃ পৃথুলোচনঃ।
তীক্ষ্ণাংশোর্ভাস্করস্যাংশঃ কর্ণোঽরিগণসূদনঃ॥
সিংহর্ষভগজেন্দ্রাণাং তুল্যবীর্য্যপরাক্রমঃ।
দীপ্তিকান্তিদ্যুতিগুণৈঃ সূর্য্যেন্দুজ্বলনোপমঃ॥ আঃ প, ১৩১।৩-৪

তিনি কুন্তীদেবীর কন্যা অবস্থায় জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার যশ সর্ব্বত্র প্রসারিত, নয়নযুগল বৃহৎ, তিনি তীক্ষ্ণরশ্মি সূর্য্যের অংশ এবং শত্রু দমন করিতে সমর্থ ; তাঁহার পরাক্রম সিংহ, বৃষ ও হস্তীর তুল্য এবং—

স্পর্দ্ধমানস্তু পার্থেন সূতপুত্রোঽত্যমর্ষণঃ
দুর্য্যোধনমুপাশ্রিত্য সোঽবমন্যত পাণ্ডবান্॥

সূত-পালিত অতিশয় কোপনস্বভাব এই কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন এবং দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণকে অবমানিত করিতেন।

কর্ণের প্রথম পরিচয় আমরা পাই কৌরব ও পাণ্ডবগণের অস্ত্রপরীক্ষার পারদর্শিতা প্রদর্শন ক্ষেত্রে। অর্জ্জুনের শিক্ষাপ্রদান যখন প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন সহসা দ্বারদেশ হইতে উত্থিত

গুরুতর বলবীর্য্যসূচক বাহ্বাস্ফোটনের ধ্বনি শুনিয়া সকলে ভাবিলেন— ব্যাপার কি! কোন পর্ব্বত কি বিদীর্ণ হইয়া গেল, অথবা জলপূর্ণ মেঘে আকাশ পরিপূর্ণ হইল? না ভূতল ভূগর্ভে প্রোথিত হইল? দেখিতে দেখিতে কর্ণ সেই বিস্তীর্ণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রিয়দর্শন দৃপ্ত মূর্ত্তি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। দুর্ভেদ্য বর্ম্মে তাঁহার তনু আবৃত এবং দুইটি অপূর্ব্ব কর্ণকুণ্ডল তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতেছিল। ধনু ও তরবারি ধারণ করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় তিনি রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুন যে সকল অপূর্ব্ব শস্ত্রপ্রয়োগকৌশল প্রদর্শন করিয়া সমবেত সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য্যের অনুমতিক্রমে শস্ত্রবিদ্যাবিশারদ কর্ণও সে সমস্তই প্রয়োগ করিলেন। দুর্য্যোধন কর্ণের সেই রণকৌশল অবলোকন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক অভিনন্দিত করিলেন। কর্ণের স্বভাবসিদ্ধ আত্মশ্লাঘা এই অপ্রত্যাশিত সহায়তায় উগ্র হইয়া উঠিল। তিনি সেই রঙ্গস্থলেই অর্জ্জুনকে প্রতিযোগী করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রয়াসী হইলেন।

কর্ণের এই স্পর্দ্ধা অর্জ্জুনের সহ্য হইল না, তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন; —যাহারা অনাহূত অবস্থায় সভায় সম্মিলিত হয় এবং অযাচিত ভাবে কথা বলে, তাহাদের জন্য যে লোক নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি তোমাকে বধ করিলে সেই লোকে তোমার গতি হইবে।

কর্ণও দৃঢ়স্বরে প্রত্যুত্তর দিলেন,—এই রঙ্গভূমিতে সকলেরই বিশেষতঃ বীর মাত্রেরই প্রবেশাধিকার আছে। সুতরাং তোমার এ কথার কোন সার্থকতাই নাই। এখানে আমাদের অপেক্ষা প্রবল পক্ষও আছেন, এবং তাঁহারা বীরনীতির অনুসরণ করিয়া থাকেন। বৃথা বাক্যাড়ম্বরে প্রয়োজন কি, তুমি বাণদ্বারাই তোমার বক্তব্য বল, আমিও বাণদ্বারাই

তাহার উত্তর প্রদান করি। অধিক কি, আমি আজ বাণদ্বারা তোমার গুরুর সমক্ষেই তোমার মস্তক ছেদন করিব।

এইরূপ বাগ্‌যুদ্ধের পর দ্বন্দ্বযুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিলে কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই যুদ্ধার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন এবং সমবেত সহস্র সহস্র দর্শক যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িলেন; অর্থাৎ কর্ণের প্রতিও অনেকেই পক্ষপাতী হইলেন।

এই সময় কর্ণের বংশ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলেন আচার্য্য কৃপ। কৃপ কহিলেন,—দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তুমি তোমার পিতা মাতা ও বংশগত পরিচয় প্রদান কর।

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ণের মুখখানি লজ্জায় অবনত হইয়া বর্ষাজল-সিক্ত বিত্রস্ত পদ্মের মত ম্লান হইয়া গেল। কিন্তু দুর্য্যোধন প্রিয় বন্ধুর পক্ষ লইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এই সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। বংশ সম্বন্ধে প্রশ্নের কথা চাপা দিয়া তিনি যুক্তি প্রদর্শন করিলেন যে, রাজার সহিত কাহারও দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপত্তি থাকিতে পারে না, এই কথা বলিয়া তিনি তখনই কর্ণকে তাঁহার অধিকৃত অঙ্গ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। কর্ণ রাজশ্রীযুক্ত হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—'এই রাজ্য দানের অনুরূপ আমি তোমাকে কি প্রদান করিব?'—দুর্য্যোধন বলিলেন,—'আমি তোমার নিকট প্রগাঢ় সৌখ্য চাই।' কর্ণ বলিলেন,—'তাহাই হইবে।' তৎক্ষণাৎ দুর্য্যোধন কর্ণকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া উভয়ে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন।

ঠিক এই সময় কর্ণের পালক পিতা সূত অধিরথ যষ্টির উপর দেহভার নির্ভর করিয়া কম্পিত পদে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। কর্ণ জানিতেন তিনিই তাঁহার পিতা, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি সসম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধা সহকারে অভিষেক-সলিল-সিক্ত-মস্তকে পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। তখন আর

কাহারও জানিতে বাকী রহিল না যে, বংশগৌরবে কর্ণ অতি হেয়। তিনি এই আগন্তুক সূতেরই পালিত পুত্র। রঙ্গভূমিতে সমবেত লোক সকলের মধ্যে পরস্পর আলোচনা আরম্ভ হইল,পাণ্ডবগণের মধ্য হইতে ভীম তাঁহাকে শ্লেষের সুরে উপহাস করিলেন। ক্রোধে কর্ণের ওষ্ঠযুগল একটু স্পন্দিত হইল মাত্র, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। যদিও বন্ধু দুর্য্যোধন পক্ষ সমর্থন করিয়া ভীমের উক্তির প্রতিবাদ করিলেন এবং বিরুদ্ধবাদি-দিগকে যুদ্ধের হুমকী দেখাইলেন, তথাপি কর্ণের সে উৎসাহ আর দেখা গেল না, যেন দৈব নির্দ্দেশে সূত অধিরথের এই আকস্মিক উপস্থিতি সমস্ত ওলটপালট করিয়া দিল। কিন্তু দুর্য্যোধন কর্ণের বংশগত দীনতা জানিয়াও তাহাকে অসামান্য শৌর্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

রঙ্গভূমির এই ঘটনাগুলি কর্ণ যেন তাঁহার মানসপটে রক্তের অক্ষরে লিখিয়া রাখিলেন। এইদিন হইতে কর্ণের ব্রত হইল কৌরবদের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা এবং পাণ্ডবদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা করা। কালক্রমে কর্ণ শনৈঃ শনৈঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের উপদেষ্টাদিগের অন্যতম হইয়া উঠিলেন। পাণ্ডব-দের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা গোপনে যখন যে কোন পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, আমরা তাহাতেই কর্ণের নির্দ্দেশ সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

কর্ণের পাণ্ডব বিদ্বেষ অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় এবং সেই বিদ্বেষবহ্নি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবার জন্য ইন্ধন সংগ্রহ করিতে লাগিল। যে সূত্রে এই বিদ্বেষের উৎপত্তি, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় সমবেত রাজগণ যখন লক্ষ্যভেদ ত' দূরের কথা, ধনু উত্তোলনেও অসমর্থ হইলেন, সেই সময় কর্ণ অনায়াসে ধনু

উত্তোলনপূর্ব্বক সকলকে চমৎকৃত করিয়া জ্যারোপণ করিলেন ও পরক্ষণে লক্ষ্যের সান্নিধ্যে গিয়া শর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দ্রৌপদী তৎক্ষণাৎ দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।

অস্ত্র পরীক্ষার পারদর্শিতা-প্রদর্শন-সভায় কর্ণের যে জাতিগত অন্তরায় শৌর্য-প্রকাশে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছিল, এখানেও দ্রৌপদীর এই অবমাননাকর উক্তিতে তাহাই সূচিত হইল। অভিমানী কর্ণ স্বয়ংবর-সমুৎসুকা কন্যার এই আপত্তি শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেলন।

অস্ত্র পরীক্ষার সভায় যে অপমানে অভিভূত হইয়া কর্ণ পঞ্চপাণ্ডবকে পরম শত্রু মনে করিয়াছিলেন, স্বয়ম্বরসভায় অনুরূপ অপমান তাঁহাকে দ্রৌপদীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই অপমানের প্রতিশোধ তিনি হস্তিনার অক্ষক্রীড়া-সভায় লইয়াছিলেন। কর্ণ যেমন বহু গুণগ্রামে বিভূষিত ছিলেন, পক্ষান্তরে কতিপয় গুরুতর দোষও তাঁহার মহৎ চরিত্রকে বিকৃত করিয়াছিল। অতিশয় স্পর্দ্ধা ও আত্মশ্লাঘা তাঁহার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া পতনের কারণ হইয়াছিল। নিজের ব্যক্তিত্বের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখিয়া কর্ণ যদি পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর আচরণকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মহাভারতের কর্ণপর্ব্বের সমাপ্তি বোধ হয় অন্যরূপ হইত।

পঞ্চ পাণ্ডবকে হৃতসর্ব্বস্ব ও পাণ্ডবদের কুললক্ষ্মী দ্রৌপদীকে সর্ব্বসমক্ষে লাঞ্ছিতা করিয়াও কর্ণের প্রতিহিংসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। বনবাসী পাণ্ডবদিগকে কৌরবগণের অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক মর্ম্মপীড়িত করিয়া তুলিবার পরিকল্পনা প্রধানতঃ কর্ণেরই। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁহার শৌর্য্যরথের দুর্ব্বার-চক্র গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে পরাজয়-কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়া

লোকসমাজে তাঁহাকে অপদস্থ এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জ্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া দিল।

দূরদর্শী দ্রোণাচার্য্য যেন অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের যবনিকান্তরালবর্ত্তী অপ্রীতিকর দৃশ্যরাজি নিরীক্ষা করিয়াই তাহার প্রতিবিধানকল্পে প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে ব্রহ্মশিরা অস্ত্র প্রয়োগ-কৌশলসহ প্রদান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যদিও কর্ণ সমরে অজেয় বলিয়াই ক্ষত্রিয়-সমাজে ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাবল জরাসন্ধ পর্য্যন্ত দ্বৈরথ সমরে ইঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া প্রীতিসহকারে মালিনী নামক রাজ্য খণ্ড উপহার দিয়াছিলেন, তথাপি গন্ধর্ব্ব-সমরে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কারণ, দৈববল সম্পন্ন এই আত্মগোপ্তা গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন মায়াযুদ্ধে এরূপ অলৌকিক কাণ্ড উপস্থিত করিতেন যে, কোন মনুষ্যই তাঁহাকে রণক্ষেত্রে দর্শন করিবার সুযোগ পাইতেন না। এরূপ অদৃশ্য শক্তির সহিত কেমন করিয়া যুদ্ধ সম্ভব হইতে পারে? কাজেই কর্ণকে নিরুপায় হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অর্জ্জুন দ্রোণ-দত্ত মায়ানাশক মহা অস্ত্র ব্রহ্মশিরা দ্বারা গন্ধর্ব্বরাজের মায়াবল চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর দুর্য্যোধনের হৃদয় যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে কর্ণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি পাণ্ডবগণের শত্রুতা বরন করিয়া লইয়াছিলেন, সেই কর্ণ গন্ধর্ব্ব-যুদ্ধে একেবারে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িলেন, এমন কি শত্রুহস্তে সপরিবার দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। লজ্জায় ঘৃণায় হস্তিনায় ফিরিয়া দুর্য্যোধন কর্ণের সহিত দেখাও করিলেন না, শুধু তাহাই নহে, এই অপমান হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তিনি প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগের সঙ্কল্প পর্য্যন্ত করিয়া বসিলেন।

কর্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নানারূপ প্রবোধ বাক্যে দুর্য্যোধনের সঙ্কল্প ভঙ্গ করিলেন এবং নিজের দুর্ব্বার পরাক্রমের

পরিচয় দিবার জন্য চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। প্রথমেই তিনি পাঞ্চাল রাজ্যে আপতিত হইলেন। যেহেতু দ্রৌপদী এই রাজ্যের রাজকন্যা এবং এই রাজ্যের রাজধানীতে অনুষ্ঠিত স্বয়ংবর-সভায় তিনি লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে রাজা দ্রুপদ পরাস্ত হইয়া বিজয়ী কর্ণকে প্রচুর সুবর্ণ, রজত, মণিরত্ন ও রথাদি করস্বরূপ প্রদানে বাধ্য হইলেন। অতঃপর তিনি ভগদত্ত প্রমুখ শক্তিশালী রাজন্যবর্গকে পরাস্ত করিয়া হিমাচল প্রদেশের নৃপতিদিগকে বশীভূত করিলেন। তৎপরে পূর্ব্বদেশীয় অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ মিথিলা প্রভৃতি প্রদেশ কুরুরাজ্যান্তর্গত করিলেন। দক্ষিণ দিকে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দাক্ষিণাত্য রাজন্যবর্গকে পরাজিত এবং করদানে বাধ্য করিলেন। অবশেষে পশ্চিম দেশীয় অবন্তীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রবল প্রতাপ বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী অঞ্চলের দুর্দ্ধর্ষ যবন, শক, আটবিক ও পার্ব্বতীয় নৃপতিবর্গকেও বিজিত ও বশীভূত করিয়া বিপুল ধনরাজিসহ হস্তিনায় বিজয়গর্ব্বে উপনীত হইলেন।

বিজয়লব্ধ ধনসম্ভারে বিপুল আড়ম্বরে অসংখ্য ভূপতি ও ব্রাহ্মণগণের উপস্থিতিতে দুর্য্যোধন বৈষ্ণব নামক মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। এই যজ্ঞের পর দুর্য্যোধনের সার্ব্বভৌম রাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন তাঁহার প্রিয় বন্ধু কর্ণ।

যজ্ঞান্তে কর্ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আত্মশ্লাঘায় অনুপ্রাণিত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন,—হে কৌরবগণ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর;—আমি যে পর্য্যন্ত অর্জ্জুনকে বধ না করি, সে পর্য্যন্ত আসুর ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্য মাংস ত্যাগ করিতেছি। এই ব্রতকালে যে কেহ আমার নিকট দানপ্রার্থী হইবে, আমি তাহাকে কদাচ প্রত্যাখ্যান করিব না।

ঘটা করিয়া দানে এইরূপ আত্মশ্লাঘার বিষময় ফল শীঘ্রই ফলিয়া গেল। কর্ণের এই ঘোষণার সূত্র ধরিয়াই অর্জ্জুনের প্রতি চিরস্নেহপরায়ণ দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গের সহজাত দুর্ভেদ্য কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। এই সহজাত কবচের প্রভাবে কর্ণ ছিলেন সর্ব্বভূতের অবধ্য। ছদ্মবেশী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত প্রার্থনা কর্ণকে স্তব্ধ করিয়া দিল। বুঝিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহার মৃত্যুর পথ স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও কর্ণ প্রতিজ্ঞাচ্যুত হইলেন না, অবিচলিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ তিনি শাণিত অস্ত্রের দ্বারা অঙ্গের বর্ম্মচ্ছেদনপূর্ব্বক রক্তাক্ত কবচ ও কুণ্ডল ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই অদ্ভুত দাতার অলৌকিক বীরত্ব ইন্দ্রকে চমৎকৃত করিল। তিনি তখন বিহ্বলকণ্ঠে কহিলেন,—আমি ইন্দ্র; তোমার শৌর্য্যে আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। আমি তোমার অলৌকিক শক্তিসম্পদ অপহরণ করিয়া লজ্জা পাইতেছি। কিন্তু ইহার বিনিময়ে আমি তোমাকে শত্রুনাশকারী এক অমোঘ শক্তি প্রদান করিতেছি। প্রাণ-সংশয়কালে তুমি যাহার বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করিবে, তাহাকে নিহত করিয়া এই শক্তি পুনরায় তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ইহার দ্বারা একজন মাত্র শত্রুই তোমার অবশ্য বধ্য হইবে, কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই অমোঘ শক্তি অতি যত্নে কর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন—চরম দ্বৈরথ-যুদ্ধে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য। কিন্তু রহস্যময়ী নিয়তি কর্ণের এ প্রচেষ্টায়ও দারুণ বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া অর্জ্জুনকে নিরাপদ করিয়া দিয়াছিলেন।

জয়দ্রথবধের পর যখন ভয়াবহ নিশাযুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং মহাবল ঘটোৎকচ সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া কুরুসৈন্য ছারখার করিতে থাকে, সেই

সাংঘাতিক অবস্থায় এই অমোঘ শক্তির এক আঘাতে কর্ণ ঘটোৎকচকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর পাণ্ডবপক্ষ শোকাভিভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের উপর দাঁড়াইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

এই বিপুল আনন্দ ও উদ্দাম নৃত্যের কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বমুখেই বর্ণনা করিলেন অর্জ্জুনের নিকট। এই সম্পর্কে কর্ণের সম্বন্ধে যে প্রশস্তি তিনি কীর্ত্তন করিলেন, কর্ণপ্রসঙ্গে তাহা অপরিহার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! কর্ণ যদি তাহার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলসমন্বিত হইয়া সংগ্রামস্থলে অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে তুমি গাণ্ডীব ও আমি সুদর্শন উদ্যত করিয়াও ঐ বীরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করিতে পারিতাম না। দেবরাজ ইন্দ্র তোমার হিতার্থেই কর্ণকে কুণ্ডল ও কবচবিহীন করিয়াছেন। কিন্তু বিনিময়ে যে শক্তি তিনি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতাম এবং কর্ণের সমক্ষে রথ চালনা করিতে বিরত হইতাম। সে সেই শক্তি দ্বৈরথ সমরে তোমাকে বধ করিবার জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ঘটোৎকচকে বিনাশ করিতে সেই শক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় তুমি নিরাপদ হইয়াছ। কিন্তু এখনও আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কর্ণ যদিও কবচ কুণ্ডল ও বাসবদত্ত অমোঘ শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তথাপি তোমা ভিন্ন এক্ষণে অপর কাহারও সাধ্য নাই যে, সমরস্থলে উহাকে সংহার করিতে পারে। সূতপুত্র নিয়ত ব্রতাচারী, সত্যবাদী, তপস্বী, ব্রহ্মানুষ্ঠায়ী এবং শত্রুগণের প্রতি নিয়ত দয়াবান। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও ঐ মহারথকে পরাজিত করিতে সমর্থ নহেন। বর্ত্তমানে উহার বধবিষয়ে এক বিশেষ উপায় আছে; দ্বৈরথ যুদ্ধের সময় কর্ণের রথচক্র পৃথিবীতে নিমগ্ন হইলে, যখন সে প্রমত্ত ও বিপন্ন হইবে, সেই অবসরে তুমি উহাকে বিনাশ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণের এই মন্ত্রণাই যথাকালে কার্য্যকর হইয়াছিল। দ্রোণের মৃত্যুর পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে কর্ণ যখন কুরুবাহিনী পরিচালনার ভার পাইলেন, সে সময় মদ্ররাজ—পাণ্ডবগণের মাতুল—রথিশ্রেষ্ঠ শল্য কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেন। কর্ণের প্রতি ইনিও প্রসন্ন ছিলেন না, বরং কর্ণকে ইনি বিশেষ বিদ্বেষ ও ঈর্ষার দৃষ্টিতেই দেখিতেন। তথাপি একান্ত বিরোধী এই নৃপতিটিকে সারথির আসনে বসাইয়া কর্ণকে পরম প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রেও এই রথী ও সারথির মধ্যে বিতর্কসূত্রে যে মনোমালিন্য ঘটে, তাহাও উপেক্ষা করিবার নহে। কিন্তু অখণ্ড আত্মবিশ্বাসী এই নরশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী সারথির নিষ্ঠায় আস্থাস্থাপন করিয়াছিলেন। পরে দ্বৈরথযুদ্ধের চরম সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জয় পরাজয়ের সন্ধিস্থলে কর্ণের রথচক্র সহসা মৃত্তিকা প্রোথিত হইবার মূলে সারথির চক্রান্তচালিত হস্তের কৌশল যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত ছিল, মহাভারতের কথাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

দুর্য্যোধনের বিপুল সম্বর্দ্ধনায় মুগ্ধ হইয়া এই মদ্রদেশবাসী নৃপতি তাঁহার পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে যুদ্ধের প্রাক্কালে পাণ্ডবগণের নিকট এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধকালে যদি কোন সময়ে সৈন্যাপত্য কর্ণের হস্তে অর্পিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় তিনি তাহার সারথ্য গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহাকে বিপন্ন করিবেন।

নিয়তির অমোঘ বিধানের নির্দ্দেশে এই পূর্ব্বসঙ্কল্পিত চক্রান্ত কর্ণের মৃত্যুর উপলক্ষ হইয়াছিল।

কর্ণের রথ যখন পঙ্কে প্রোথিত হইল, সারথি নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়; কর্ণ তখন অর্জ্জুনের উদ্দেশে ক্ষণকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রসঙ্গ তুলিয়া কর্ণের প্রার্থনা উপেক্ষা ও অর্জ্জুনের

প্রতিহিংসা উদ্দীপ্ত করিয়া দিলেন। কর্ণ তখন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে অর্জ্জুনকে হতচেতন করিয়া রথ হইতে নামিয়া রথচক্র পঙ্কমুক্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত অর্জ্জুন তাঁহারই নির্দ্দেশে তীক্ষ্ণ অস্ত্রে কর্ণের শিরশ্ছেদ করিলেন। কর্ণের উন্নত কলেবর কুলিশ-বিদলিত গৌরিকস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশায়ী হইল।

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য যেন কর্ণের দুই পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছে। কখনও দেখিতে পাই, তাঁহার অতুল প্রতিষ্ঠা দেশব্যাপী সুখ্যাতি সুযশ; আবার পরক্ষণেই নিদারুণ নিন্দা ও বিদ্বেষ যেন তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে উদ্যত। কর্ণের সম্বন্ধে মহাভারতের মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনসমক্ষে কি উচ্চ প্রশস্তিই কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্‌কালে এই কর্ণকেই ভীষ্মদেব সর্ব্বসমক্ষে অর্দ্ধরথীর সংজ্ঞা দিয়া তাঁহার সৈনাপত্যকালে কর্ণকে নিরস্ত্র করিয়া রাখিলেন। রথচক্র পঙ্কেপ্রোথিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের সমীচীন অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর বাক্যশল্যে জর্জ্জরিত করিলেন; অথচ তিনিই কুরুসভায় সন্ধি-স্থাপনের দৌত্যে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে কর্ণকে বিরলে ডাকিয়া তাহার রহস্যময় জন্মকথা প্রকাশপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত যোগদানে প্ররোচিত করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, কুন্তীদেবীও নির্জ্জনে কর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, তিনিই তাঁহার জননী, কর্ণ সূত-পুত্র নহেন।

এইখানেই কর্ণের হৃদয়নিহিত অসামান্য ত্যাগ-শক্তির প্রভাব সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। কর্ণ প্রলুব্ধ হইলেন না। পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠরূপে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভারত-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিবার প্রলোভন তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না। তিনি দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন—দুর্য্যোধন আমার বন্ধু, তিনি আমাকে অত্যন্ত সম্মানিতভাবে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আমি আমরণ তাঁহারই অনুরক্ত থাকিব, তাঁহার জন্য শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব। কুন্তীকে কহিলেন,—আপনি আমার গর্ভধারিণী হইলেও, আমি জানি রাধাই আমার মাতা; সূতপুত্র বলিয়া আমার যে পরিচয় আছে, আমি তাহাই বরণ করিয়া লইয়াছি। আসন্ন যুদ্ধের সময় আমি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইব না। কর্ণের এই অলৌকিক নির্লোভতা এবং মানসিক দৃঢ়তা তাঁহার চরিত্রকে প্রকৃতই মহান ও বরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

তবে কুন্তীদেবীর নিকট যে প্রতিশ্রুতি কর্ণ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনিও বিচ্যুত হন নাই। পর পর চারি পাণ্ডবকে পরাস্ত এবং করায়ত্ত করিয়াও তিনি তাহাদিগকে বধ করেন নাই, নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন ছিলেন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী,—হয় অর্জ্জুনকে তিনি বধ করিবেন, নতুবা অর্জ্জুন হস্তে তিনি হত হইবেন,—মাতৃসন্নিধানে এই প্রতিশ্রুতি, আত্মাহুতি দিয়া তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

গঙ্গা

মহাভারতের বিশিষ্ট নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে গঙ্গাদেবী যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং মহাভারতের কথার সহিত অলৌকিক শক্তিসম্পন্না এই রহস্যময়ী নারীর বিচিত্র কাহিনী অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই গঙ্গাদেবী কুরুরাজ শান্তনুর প্রথমা মহিষী এবং দেবব্রত ভীষ্মের জননী। ইনি যে অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী, রাজনীতিকুশলা, অসামান্যা বুদ্ধিমতী, দূরদর্শিনী ও তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন, তাঁহার অসাধারণ আচরণেই তাহা প্রকাশ পায়।

ইঁহার চরিত্রগত অলৌকিক অংশটুকু এই যে, একদা মহাতেজা বসুগণ মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা পুণ্য-সলিলা-রূপিণী গঙ্গাদেবীর নিকট প্রর্থনা করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করেন এবং জন্মমাত্রই গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। দেবী তাহাতে সম্মত হন।

কিন্তু গঙ্গাদেবী ত বসুদিগকে গর্ভে ধারণ করিবার জন্য যাহাকে তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারেন না; কে এমন আদর্শ পুরুষ, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি বসুগণের মুক্তির ব্যবস্থা করিবেন?

মর্ত্তে আসিয়া দেবী জানিতে পারিলেন যে, কুরুরাজ শান্তনুই মর্ত্তের আদর্শ রাজা, সর্ব্বগুণবান্ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। দেবী তাঁহারই ভার্য্যাত্ব স্বীকার করা সমীচীন মনে করিলেন।

রাজা শান্তনু অতিশয় মৃগয়ানুরক্ত ছিলেন। একদা বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন।

গঙ্গাদেবী কহিলেন,—আমি এই সর্ত্তে তোমার পত্নী হইতে সম্মত আছি যে, আমি যে-কোন কার্য্য করি না কেন, তাহা ভাল হোক বা মন্দ হোক, তুমি আমাকে তিরস্কার বা নিবারণ করিতে পারিবে না। করিলে আমি তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইব।

রাজা এই কন্যাকে দেখিয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, কোনরূপ বিচার বিবেচনা না করিয়াই তাঁহার উক্ত সর্ত্তে সম্মত হইলেন।

গঙ্গাদেবী রাজার সহিত রাজধানীতে আসিয়া তাঁহার মহিষী হইলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার গর্ভে সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল এবং তাহারা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তিনি একে একে তাহাদিগকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বিনষ্ট করিলেন। নিয়মবদ্ধ রাজা স্তব্ধভাবে রাজ্ঞীর এই নিষ্ঠুরাচরণ সহ্য করিয়া চলিলেন। কিন্তু অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিতেই তিনি বাধা দিয়া কহিলেন,—এ পুত্রকে তুমি নষ্ট করিতে পারিবে না।

বাধা পাইয়া রাণী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—ভয় নাই, তোমার এ পুত্রটিকে আমি বধ করিব না। কিন্তু মনে রাখিও, তুমি নিয়মভঙ্গ করিয়াছ, আমিও আর এখানে থাকিব না।

ইহার পর তিনি নিজের পরিচয় দিলেন এবং কেন যে এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, তাহাও জানাইলেন।

রাজ্ঞী যে ছদ্মবেশিনী দেবী, তাহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতি রাজার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল এবং রাজার অসহায় অবস্থাটুকু বুঝিতে পারিয়া দেবী এই সর্ত্তে নবজাত পুত্রটিকে লইয়া গেলেন যে, তাহাকে নিজের তত্ত্বাবধানে

রাখিয়া রক্ষণাবেক্ষণ ও লালনপালন করিবেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পুনরায় রাজার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

এই ঘটনার পর দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে রাজ্ঞী বা রাজপুত্রের সহিত রাজার আর দেখা সাক্ষাৎ ঘটিল না। রাজা বোধ হয় পুত্রের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সেই পুত্রের সাক্ষাৎ পাইলেন।

রাজা প্রথমে পুত্রকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গা দেবী সেই সময় রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া পুত্রকে পিতার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। রাজাও চমৎকৃত হইয়া কৃতবিদ্য সর্ব্বগুণবান্ পুত্রকে কুরুরাজ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারিরূপে গ্রহণ করিলেন।

এই আখ্যায়িকার অলৌকিক অংশের ভিতর দিয়া আমরা এই সত্যটুকু গ্রহণ করিতে পারি যে, রাজা শান্তনু নিরুপায় হইয়া গঙ্গাদেবীর হস্তেই নবজাত সন্তানকে অর্পণ করেন এবং দেবী তাঁহাকে গঙ্গাসৈকত সন্নিহিত তপোবনে লইয়া গিয়া সযত্নে প্রতিপালন করিতে থাকেন। তিনি জানিতেন যে, এই পুত্র কুরুরাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী; সুতরাং রাজপুত্রোচিত শিক্ষার যে ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন, কোন অংশে তাহার ত্রুটি ছিল না। শস্ত্রবিশারদ রাজা শান্তনু এই প্রিয়দর্শন কিশোরের অসামান্য শস্ত্রবিদ্যার নিদর্শন পাইয়া যখন সবিস্ময়ে জানিতে চাহিলেন—কে এই বালক, কাহার পুত্র, কোন পুণ্যবংশ সে উজ্জ্বল করিয়াছে? তখন গঙ্গাদেবী সেইখানে সহসা উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—এই পুত্র তোমার। অতীতের কথা কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ রাজা? তোমার আজ্ঞায় আমি এই পুত্রের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম। যথাশক্তি আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। নিখিল বিশ্বের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর পরশুরাম তোমার পুত্রকে যাবতীয় অস্ত্রকৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। তাহার ফলে এই বালক

ভার্গবতুল্য দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্দ্ধর হইয়াছে। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বেদজ্ঞ ঋষিগণ ইহাকে সকল বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছেন। এই বয়সেই তোমার পুত্র অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির অধিকারী হইয়াছ। তুমি এখন ইহাকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া অনায়াসে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পার। অতঃপর রাজার হস্তে তাঁহার গচ্ছিত সন্তানকে অর্পণ করিয়া গঙ্গাদেবী অন্তর্হিত হইলেন।

এই রহস্যময়ী নারী একদিন যেমন অকস্মাৎ রাজার চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন, এদিনও তেমনই বিস্ময়ানন্দে অভিভূত রাজার হস্তে সযত্ন-পালিত কৃতবিদ্য সন্তানটিকে সঁপিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এই মহিমময়ী দেবীর পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম—মহাভারতের অসামান্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন মহাপুরুষ।

গান্ধারী

মহাভারতের এই মহীয়সী মহিলা অপূর্ব্ব চরিত্র-মহিমায় যে বহু বিশিষ্ট চরিত্রকে অতিক্রমপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিতা এবং তাঁহার ত্যাগ ও তিতিক্ষার মহিমময় কাহিনী মহাভারতের কথাকে যে অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ করিয়া রাখিয়াছে, একথা শ্রদ্ধার সহিত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতের সীমান্ত প্রদেশে, গান্ধার রাজ্য প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিল; বর্ত্তমানে তাহা আফগানিস্থানের অন্তর্গত কান্দাহার নামে সুপরিচিত। গান্ধারী দেবী এই রাজ্যাধিপতি সুবলের দুহিতা ছিলেন। বিখ্যাত কুরু-বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ বুঝিয়া এবং প্রচুর শুল্ক পাইয়া রাজা সুবল জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হন। এ সম্বন্ধে মহাভারতের কথা এইরূপ—

গান্ধারী ত্বথ শুশ্রাব ধৃতরাষ্ট্রমচক্ষুষম্।

আত্মানং দিৎসিতঞ্চাস্মৈ পিত্রা মাত্রা চ ভারত॥ আঃ পঃ ১১০।১৩

গান্ধারী শুনিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ; অথচ পিতা ও মাতা তাঁহারই হস্তে তাঁহাকে দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

কিন্তু সুন্দরী, শিক্ষিতা ও বয়ঃস্থা রাজকন্যা পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারিণী হইলেন না, কোন প্রকার আপত্তিও তুলিলেন না, পিতা-মাতার ইচ্ছার সহিত নিজের প্রবৃত্তির সংযোগ করিয়া অনাগত স্বামীর উদ্দেশে নিষ্ঠা সহকারে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ততঃ সা পট্টমাদায় কৃত্বা বহুগুণং শুভা।

ববন্ধ নেত্রে স্বে রাজন্! পতিব্রতপরায়ণা॥ আঃ পঃ ১১০।১৪

তাহার পর—আমি পতিকে অতিক্রম করিব না—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পতিব্রতার্থিনী গান্ধারী একখানি পট্টবস্ত্র বহু ভাঁজ করিয়া তদ্দ্বারা নিজের নয়নযুগল বন্ধন করিলেন।

স্বামী যাঁহার জন্মান্ধ, জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্য ও আলোক-মাধুর্য্য দর্শনে যিনি জন্মাবধি বঞ্চিত, তাঁহারই সহধর্ম্মিণী হইয়া কেমন করিয়া তিনি সেই সৌন্দর্য্য ও আলোক-মাধুর্য্য উপভোগ করিবেন? সুতরাং বুদ্ধিমতী সাধ্বী নিজেকেও সহজাত ও স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বামীর সাহচর্য্যে অন্তর মধ্যে সত্য শিব ও সুন্দরের অপূর্ব্ব আলোকসৃষ্টির সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বধূরূপে হস্তিনায় আসিয়া গান্ধারী দেবী পতিভক্তি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, সদ্ভাব, ব্যবহার ও কার্য্যদ্বারা কুরুবংশীয় সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। প্রয়োজনানুরূপ আচরণে গুরুজনদিগকে তিনি পরিতুষ্ট করিতেন বটে, কিন্তু বাহিরের বা সম্পর্কহীন অন্য কোন পুরুষের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। বিশ্রাম লাভের সময় অন্ধ স্বামীর সহিত কথোপকথনেই তিনি অতিবাহিত করিতেন। কুরুবংশের পুরুষ ও মহিলাগণ সকলেই এই তেজস্বিনী ও সংযতবাক বধূকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেন।

দেবী গান্ধারী নিষ্ঠার সহিত যেমন স্বামী সেবায় অবহিত থাকিতেন, অন্ধ স্বামীকে সত্য শিব সুন্দরের আসনে বসাইয়া ইষ্ট জ্ঞানে পূজা করিতেন, ধর্ম্ম এবং সত্যকেও সেইরূপ তাঁহার ইষ্ট পূজার উপচাররূপে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই সত্য ও ধর্ম্ম অনেক সময় তাঁহাকে পুত্রস্নেহে অভিভূত পথভ্রষ্ট স্বামীর বিরুদ্ধাচরণেও প্রেরণা দিয়াছে। অধর্ম্মচারী পুত্রগণের পক্ষপাতী মোহগ্রস্ত স্বামী যখন রাজধর্ম্ম ও পিতার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্বিতীয়বার দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন, তখন গান্ধারী দেবী স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্যূতে প্রতিবাদ

জানাইয়া যে মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ দেন, তাহাতেই তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সেই উপদেশ বাক্য এইরূপ—

মা নিমজ্জীঃ স্বদোষেণ মহাপ্সু ত্বং হি ভারত।
মা বালানামশিষ্টানামভিমংস্থা মতিং প্রভো॥
মা কুলস্য ক্ষয়ে ঘোরে কারণং ত্বং ভবিষ্যসি।
বদ্ধং সেতুং কো নু ভিন্দ্যাদ্ধমেচ্ছান্তঞ্চ পাবকম্॥

অর্থাৎ—হে ভারত! আপনি নিজ দোষে বিপদ্‌-সাগরে নিমগ্ন হইবেন না। হে প্রভো! আপনি অশিষ্ট মূর্খদিগের মতে মত দিবেন না, কুলের ঘোরতর সংহারের উপলক্ষ হইবেন না। হে ভরতর্ষভ! বদ্ধ সেতু ভগ্ন করিতে এবং নির্ব্বাপিত অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে কে উৎসাহিত হয়? অতএব আপনি আপনার পুত্রদিগের কার্য্যদর্শী হউন; তাহারা আপনার পরামর্শানুসারে চলুক, মর্য্যাদা ভঙ্গ করিয়া যেন চিরকালের নিমিত্ত আপনাকে পরিত্যাগ না করে।

এই সকল যুক্তি প্রদর্শনের পর দুর্য্যোধন-জননী মহাদেবী গান্ধারী দৃঢ়স্বরে পুত্রসম্বন্ধে স্বামীকে শেষ নির্দ্দেশ দিলেন,—

ত্বন্নেত্রাঃ সন্তু তে পুত্রা মা ত্বাং দীর্ণাঃ প্রহাসিষুঃ।
তস্মাদয়ং মদ্বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ॥ অঃ পঃ ১৫।৮

অর্থাৎ—এককালে সকলের বিনাশ না হয়, এ কারণ আপনি আমার বাক্যে এই কুলপাংসন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন।

কুরু-পাণ্ডব-দ্বন্দ্বে অধর্ম্মনিষ্ঠ পুত্রের বিরুদ্ধে এই মহীয়সী মহিলার তেজোদীপ্ত উক্তি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, সন্দেহ নাই। এরূপ মাতৃচরিত্র জগতের ইতিহাসে অতি অল্পই দেখা যায়।

পণমুক্ত পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি-স্থাপনে গান্ধারী দেবী যথাশক্তি প্রয়াস করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন জননীর

যুক্তিপূর্ণ উক্তির কোন প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া অশিষ্টের মত সভাস্থল ত্যাগ করিয়া যান। পুত্রের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া জননী আর তাঁহাকে কোন অনুরোধ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ যে পথ অবলম্বন করিতেছেন, তাহাতে তাহাদের কল্যাণের কোন সম্ভাবনাই নাই। অধর্ম্মী কখনও বাহুবলে ধর্ম্মকে জয় করিতে পারে না। এই জন্যই তিনি যুদ্ধযাত্রাকালে আশীর্ব্বাদপ্রার্থী পুত্রদিগকে মুক্ত-কণ্ঠে 'জয়ী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন নাই, তিনি শুধু বলিয়াছিলেন,—যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।

কিন্তু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এত কঠোর এবং ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সম্পন্না হইলেও দুর্য্যোধনের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ যখন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন যেন পাষাণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ অবস্থাতেও শোকাতুর স্বামীর শোচনীয় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সাধ্বী সতী তাঁহার অন্তরের সমস্ত শক্তি স্বামীর রক্ষার্থ নিয়োযিত করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে মৃত পুত্রদিগের অসংহৃত দেহসমূহ দর্শনে দেবী গান্ধারী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! এই সময় শ্রীকৃষ্ণ সহ পাণ্ডবগণ তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে পুত্রশোকাতুরা গান্ধারী দেবী যুধিষ্ঠিরকে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাসদেব তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন,—বৎসে! যুদ্ধের পূর্ব্বে তুমিই দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলে—যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। ধর্ম্মশীল পাণ্ডবগণ তোমার সেই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং তুমি ধর্ম্ম ও আত্মবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক রোষ সংবরণ কর।

দেবী গান্ধারী ব্যাস বাক্যে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন,—ভগবন্! পাণ্ডবগণের অনিষ্ট আমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু পুত্রশোক আমাকে অতিমাত্রায় বিহ্বল করিয়াছে।

এই সময় দ্রৌপদী তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিলেন,—আর্য্যে! আমার অভিমন্যু ও পুত্রগণ কোথায়?

দ্রৌপদীকে দেখিয়া ও তাঁহার আর্ত্তকণ্ঠের এই প্রশ্ন শুনিয়াই দেবী গান্ধারী যেন পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন। বুঝিলেন, শোকাতুরা তিনি একা নহেন। দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং বধূ উত্তরার বিলাপ তাঁহাকে আবার যেন অতীতে ফিরাইয়া লইয়া গেল। তিনি বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দ্রৌপদীর দিকে চাহিয়া গাঢ় স্বরে কহিলেন,—মা! তুমি আর শোক করিও না। আমিও তোমার ন্যায় পুত্রহীনা হইয়াছি। আমাদেরই দোষে আমরা একান্ত দুঃখিনী হইয়াছি। এখন তুমি শোকে অভিভূত হইলে আমাকে কে সান্ত্বনা দিবে!

গান্ধারীর শোকও স্বামীকে উপলক্ষ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। শোকার্ত্ত স্বামীর অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—হে কেশব! আমি যখন এই জ্ঞাতিবিনাশক সংগ্রামের প্রাক্কালে দুর্য্যোধনকে বলিয়াছিলাম,—যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়; তখন আমি পুত্রদিগকে নিহত জানিয়াও কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই। কিন্তু নির্ব্বান্ধব বৃদ্ধ রাজার নিমিত্ত আমি শোকে এরূপ অভিভূত হইয়াছি।

অতঃপর দেবী গান্ধারীর শেষ জীবনের ব্রতই হইয়াছিল পুত্রশোকাতুর স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া, বিবিধ উপাখ্যানাদি শুনাইয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখা। পুত্রশোক সাধারণতঃ জননীর চিত্তেই গভীর বেদনার সৃষ্টি করিয়া থাকে; কিন্তু স্বামিসর্ব্বস্ব গান্ধারী সে শোক দমন করিয়া শোকাতুর স্বামীকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে কি প্রয়াসই না করিয়াছিলেন! তিনি বুঝিতেন যে, তাঁহার স্বামী অধর্ম্মাচারী নহেন, বহু গুণের তিনি আধার স্বরূপ; কিন্তু পুত্রস্নেহ তাঁহার বিবেক বিবেচনা শিথিল করিয়া দিয়াছিল। সেই

স্নেহভাজন পুত্রদিগের বিচ্ছেদজ্বালা তাঁহার পক্ষে ঘোর সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সেই শোক অপনোদন করিতে তিনি আপনার সমস্ত সত্ত্বাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন শুধু স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া।

এই জন্যই এই পূতচরিত্রা তেজস্বিনী ধর্ম্মশীলা ও ধরণীর মত সহনশীলা নারী মহাভারতের যশস্বিনী নারীবৃন্দের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ত্যাগে নিষ্ঠায় পাতিব্রত্যে সমগ্র নারীজাতির নমস্যা হইয়া আছেন।

কুন্তী

মহাভারতের কথায় পাণ্ডবজননী মনস্বিনী কুন্তীদেবীর প্রসঙ্গে তাঁহার অসামান্য সহনশীলতার সহিত সত্য-নিষ্ঠার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও অপূর্ব্ব। ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির দ্যোতনা যেমন গান্ধারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কুন্তীর অসাধারণ ধৈর্য্য এবং সত্যনিষ্ঠা ও তেমনই বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

কুন্তীর সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি হইতেই এই হিংসাদ্বেষহীনা নারী-রত্নের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের সেই উক্তি এইরূপ –

> কা নু সীমন্তিনী ত্বাদৃক্ লোকেষস্তি পিতৃস্বসঃ।
> শূরস্য রাজ্ঞো দুহিতা আজমীঢ়কুলংগতা ॥
> মহাকুলীনা ভবতি হ্রদাৎ হ্রদমিবাগতা।
> ঈশ্বরী সর্ব্বকল্যাণী ভর্ত্রা পরমপূজিতা ॥
> বীরসূর্ব্বীরপত্নী ত্বং সর্ব্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ।
> সুখদুঃখে মহাপ্রাজ্ঞে ত্বাদৃশী সোঢ়ুমর্হতি ॥

অর্থাৎ—হে মহাপ্রাজ্ঞে! এই পৃথিবীতে আপনার মত সৌভাগ্যবতী নারী আর কে আছে! আপনি শূরসেন নৃপতির দুহিতা এবং আজমীঢ় কুলে পরিণীতা। মহাকুলে জন্মগ্রহণ এবং মহাকুলে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় যেন এক হ্রদ হইতে আর এক হ্রদে মিলিতা হইয়াছেন। আপনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী, সর্ব্বকল্যাণবতী এবং ভর্ত্তার নিরতিশয় আদর-ভাগিনী ছিলেন। বীরপত্নী হইয়া আপনি মহাবীর নন্দনগণের জননী

হইয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীলোকের যে সকল গুণ থাকা সম্ভব, তাহাদের কিছুই অভাব আপনার নাই। আপনার ন্যায় মনস্বিনী মহিলাকে সুখ ও দুঃখ সমভাগেই ভোগ করিতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশস্তি যে সর্ব্বাংশে মহাদেবী কুন্তীর প্রতি প্রযোজ্য এবং তিনি যে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রায় সুখভোগে আত্মবিস্মৃতা ও দুঃখের কবলে নিপতিতা হইয়া বিচলিতা হন নাই, মহাভারতের কথায় তাহা আমরা সম্যক্‌রূপেই জানিতে পারি।

যৌবনে তিনি ছিলেন শৌর্য্যশালী স্বামীর সুযোগ্যা সহচরী। আবার বনে বিহাররত মৃগযূথপতিকে বধ করিবার পর মৃগীবৃন্দের আকুল আর্ত্তনাদে স্বামী যখন সর্ব্বত্যাগী, এমন কি প্রাণাধিকা পত্নী কুন্তী ও মাদ্রীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর, কুন্তীই তখন স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণীর মত তাঁহাকে শাস্ত্রানুযায়ী যুক্তি প্রদর্শন করিলেন,—আমরাও তোমার সহিত তপস্যা করিব; তোমার ন্যায় আমরাও ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক বল্কল ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া সুখে দিনপাত করিব এবং এক সঙ্গেই পরলোক গমন করিব!

স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে বিহ্বল না হইয়া কুন্তীদেবী মাদ্রীকে কহিলেন,—ভগিনি! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন রোদন করিয়া কোন ফল নাই। আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা পত্নী, সুতরাং আমি তাঁহার সহমৃতা হইব। তুমি আমার অবর্ত্তমানে সন্তানগণকে সাবধানে পালন করিও।

কিন্তু মাদ্রী যখন তাঁহাকে সকাতরে জানাইলেন,—'দিদি! তোমার অবর্ত্তমানে সন্তানগণকে লালনপালন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না, অতএব আমাকে পতির সহগমনের অনুমতি দাও। তখন সন্তানগণের দিকে চাহিয়া তিনি সে প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া পারেন নাই।

পতিশোকাতুরা মাদ্রীদেবী কুন্তীর অনুমতি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীর মৃতদেহের উপর নিপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

কুন্তী ছিলেন আদর্শ মাতা। পঞ্চপুত্রের লালন পালনের ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাদ্রীর কথায় মাতার কর্ত্তব্য তাঁহাকে সচেতন করিয়া দিল। তিনি বুঝিলেন, এ সময় শোকে অভিভূত হইয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহাদের সন্তানগণের কুরুরাজ্যে প্রতিষ্ঠার কোন উপায় থাকিবে না। পুত্রগণের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাঁহাকে শোকবারণের সামর্থ্য দিল।

অতঃপর এই ধৈর্য্যশীলা পতিবিয়োগবিধুরা বিধবা মহর্ষিগণের সহায়তায় পিতৃহীন সন্তানগণের সহিত মৃত পতি ও সপত্নীর দেহ লইয়া হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। ইনি যে কতদূর কষ্টসহিষ্ণু ও সহনশীলা ছিলেন, এই ঘটনা হইতেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হিংসার বিরুদ্ধে কুন্তী কোনদিন কোন প্রতিবাদ করেন নাই, তিনি নিজ পুত্রগণকেই সতর্ক ও অহিংসভাবাপন্ন হইতেই প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

রঙ্গভূমিতে কর্ণের অলৌকিক লক্ষণ দেখিবামাত্রই কুন্তী তাঁহাকে নিজ পুত্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং কর্ণ অঙ্গদেশের রাজা হইলেন জানিয়া মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিলেন।

জতুগৃহের ভয়াবহ চক্রান্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কুন্তী যখন পুত্রগণের সহিত পলায়নপরা, তখনও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উদ্দেশে তাঁহার মুখ দিয়া কোন রূঢ়বাণী নির্গত হয় নাই। পথশ্রমে অতিমাত্রায় শ্রান্ত ও পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া তিনি আপন মনে শুধু এই কথাই বলিয়াছিলেন,—হায়! পাণ্ডবগণের জননী হইয়া এবং পুত্রগণের মধ্যে থাকিয়াও আমি আজ পিপাসায় কাতর হইলাম!

এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থাতেও পাণ্ডবজননীর মুখে তাঁহাদের নিগ্রহকারী-দের বিরুদ্ধে অভিশাপবাণী ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই।

পরের দুঃখে কুন্তীদেবী যে কিরূপ কাতর চিত্তা ছিলেন, পরোপকারের জন্য নিজের পুত্রদের বিপদও কিরূপ উপেক্ষা করিতেন, বক রাক্ষসের উদ্দেশে পুত্র ভীমকে প্রেরণ করাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজেদেরই তখন আশ্রয়স্থান নাই, উদরান্নের সংস্থান নাই, ভিক্ষাবৃত্তি সম্বল, এই অবস্থাতেই তিনি এই দুষ্কর ত্যাগের পরিচয় দিলেন।

কুন্তীদেবী যেমন কোনদিন অন্তরে অসূয়াকে স্থান দেন নাই। তেমনই মিথ্যাও কদাচ তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পায় নাই।

দ্রৌপদীর সম্বন্ধে না জানিয়া তিনি যে নির্দেশ দিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁহার মর্ম্মবাণী কি মর্ম্মস্পর্শী! তিনি কহিলেন,—হে পুত্র! তোমরা কি আনিয়াছ তাহা না জানিয়া 'ভিক্ষালব্ধ ধন সকলে মিলিয়া সমানভাবে ভোগ কর' এইরূপ কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। এখন আমার কথা যাহাতে মিথ্যা না হয়, এবং তজ্জন্য আমাকে অধর্ম্মে পতিত হইতে না হয়, এমন কিছু বিধান তুমি কর।

সত্যে অবিচলিতা জননীর মুখের কথার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে মাতৃভক্ত সন্তানগণ যে কার্য্য করিলেন, তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং লোকাচার বিরুদ্ধ হইলেও সত্যের জন্য তাঁহারা লোকাপবাদ বা জনসমাজের সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না।

ইহার পর পাণ্ডবগণ যখন সাম্রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিপুল সমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, তখনও আমরা দেখিতে পাই, রাজমাতা কুন্তীদেবী নিরহঙ্কারচিত্তে সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানে রত। পুত্রগণের আশাতীত প্রতিষ্ঠায় তিনি গৌরবান্বিতা, কিন্তু তজ্জন্য কিছুমাত্র প্রমত্তা বা গর্ব্বিতা নহেন। আবার সেই পুত্রগণ যখন দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া

জননীর চরণবন্দনাপূর্ব্বক বনগমন করিলেন, তখন তাঁহার বিলাপেও কোনরূপ জ্বালা নাই। তিনি শুধু এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—যাহারা ভ্রমেও কখন ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই, সুচরিতগণের অগ্রগণ্য বলিয়া যাহারা সুপ্রশংসিত, তাহাদের এই বিষম ব্যসন উপস্থিত হইল কেন? এক্ষণে আর কাহাকে এজন্য অপরাধী করিব? আমার ভাগ্যদোষেই এইরূপ হইয়াছে।

রাজ্যবাসী সকলেই যে সময় পাণ্ডবগণের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য শকুনি-চালিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে অপরাধী জানিয়া নিন্দাবাদ করিতেছিলেন, পাণ্ডবজননী কুন্তীর মুখ দিয়া তাহাদের সম্বন্ধে তখন কোন নিন্দাবাণীই নির্গত হইল না। পুত্রগণের এই নিদারুণ দুর্দ্দশার নিমিত্ত করিলেন তিনি নিজের অদৃষ্টকে।

প্রতিজ্ঞা-পালনের পর ত্রয়োদশ বৎসরান্তে পাণ্ডবগণ যখন প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পাণ্ডবগণের স্বার্থ-রক্ষার্থ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণের সহিত পুত্রগণ সম্বন্ধে কুন্তীদেবীর যে কথোপকথন হয়, তাহাতেও এই ধৈর্য্যশীলা নারীর অসাধারণ তিতিক্ষা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আমি বৈধব্য, সম্পদ্‌হানি ও জ্ঞাতিগণের শত্রুতার কষ্ট অপেক্ষা পুত্রগণের অদর্শনে অধিক শোকাবিষ্ট হইয়াছি।

কিন্তু শোকের মধ্যেও তিনি ক্ষত্রনারীর ক্ষত্রিয়সুলভ আচারনিষ্ঠা বিস্মৃত হন নাই। তিনি সংযতকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—আমার পুত্রগণও প্রতিজ্ঞা-পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালনে তাহারা যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না করে; দ্রৌপদী যেন অনাথা হইয়াও অনাথের মত ক্লেশ প্রাপ্ত না হন।

এই সংক্ষিপ্ত কয়টি কথায় ক্ষাত্রধর্ম্মাচরণের যে তেজোদৃপ্ত নির্দ্দেশ

রহিয়াছে, তাহা পাণ্ডবজননীরই উপযুক্ত। এই জন্যই আমরা এই মনস্বিনী মহিলার চরিত্রে দেখিতে পাই যে, একদিকে তিনি যেমন অসামান্য সহশীলা, অসূয়া ও অহঙ্কার শূন্যা দয়াবতী নারী, অন্য দিকে তিনি বীর পত্নী, রাজমাতা, ন্যায় ধর্ম্মের রক্ষয়িত্রী। ধার্ত্তারাষ্ট্রগণের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ নাই, হিংসা নাই, তাঁহাদের উচ্ছেদও তাঁহার বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ অশান্তি ও রক্তপাতের আশঙ্কায় ক্ষত্রধর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক বৈরাগ্যবৃত্তি অবলম্বন করুক, ইহাও তাঁহার অনভিপ্রেত; এই জন্যই তিনি পুত্রগণকে এই সর্ব্বনাশকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করেন নাই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর বিজয়ী পাণ্ডবগণ যখন সাম্রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন পাণ্ডবজননী কুন্তী এবং পুত্রশোকাতুরা গান্ধারীদেবীর মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ কোন তারতম্য আমরা দেখিতে পাই না। যেন নিয়তি চালিত দুর্ঘটনার দুর্ব্বার আঘাতে এক সঙ্গে দুইটি দেহই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, নিদারুণ শোকের একই ঝঞ্ঝা উভয় দেহই মথিত করিয়া দিয়াছে। দেবী গান্ধারী দেহমন স্বামীর সেবায় নিয়োজিত করিয়া দুঃসহ পুত্রশোক ভুলিতে চাহিয়াছিলেন, আর পাণ্ডবজননী কুন্তী দেবী শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোকশান্তির জন্য সাম্রাজ্যাধিকারী পুত্রগণকে ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন।

সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ অদ্ভুত সহনশীলতার আর একটি কাহিনী আছে কিনা সন্দেহ।

দ্রৌপদী

জনকদুহিতা সীতা যেমন রামায়ণের প্রাণস্বরূপিণী, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ-কন্যা দ্রৌপদীকেও সেইরূপ মহাভারতের জীবন-সঞ্চারিণী শক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্রৌপদীর জন্মকালে এইরূপ আকাশবাণী শ্রুত হইয়াছিল—

সর্ব্বযোষিদ্বরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ ক্ষত্রিয়ান ক্ষয়ম্।
সুরকার্য্যমিয়ং কালে করিষ্যতি সুমধ্যমা।
অস্যা হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপৎস্যতে ভয়ম্॥ আদি প, ১৬৮।

অর্থাৎ—এই কন্যা সমস্ত রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা এবং ক্ষত্রিয়কুলের ক্ষয়াকাঙ্ক্ষিণী হইবেন। ইঁহা হইতে যথাকালে দেবকার্য্য সাধিত এবং কৌরবগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে।

দ্রৌপদীর এই জন্ম-বৃত্তান্তের পর একেবারে স্বয়ম্বরসভায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত কৃতস্নানা অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী দ্রৌপদী অনুপম বসন-ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া হস্তে বিচিত্র কাঞ্চনীমালা ধারণপূর্ব্বক সভাস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। কৃষ্ণবর্ণা হইলেও তাঁহার সুদৃশ্য অঙ্গসৌষ্ঠব, পদ্মপলাশসদৃশ দীর্ঘায়ত নীল নেত্রদ্বয়, রূপসৌন্দর্য্য-মণ্ডিত অপূর্ব্ব দেহকান্তি স্বয়ম্বরসভায় সমবেত রাজন্যসমাজকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

রাজা দ্রুপদ শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরকে কন্যা সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে এক সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন এবং ঘূর্ণমান—আকাশ-যন্ত্র-রক্ষিত অত্যুচ্চ

লক্ষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সুসজ্জিত সুবিশাল স্বয়ম্বরসভায় সমবেত রাজগণকে লক্ষ্য করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন, এই ধনুর্ব্বাণ ও লক্ষ্য উপস্থিত রহিয়াছে। যিনি আকাশ-যন্ত্রের ছিদ্র মধ্য দিয়া পঞ্চ শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক লক্ষ্যপাত করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন।

কিন্তু অভিজাতবংশীয় রাজপুত্রগণ সকলেই যখন লক্ষ্যভেদ ত দূরের কথা, ধনুকে জ্যা-সংযোগ করিতেও সমর্থ হইলেন না এবং একে একে লজ্জিত ও নিস্তেজ হইয়া দ্রৌপদীর আশা ত্যাগ করিলেন,—তখন উঠিলেন অঙ্গরাজ কর্ণ।

কিন্তু অমনই চারিদিক হইতে ইঁহার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইতে লাগিল; সে সকল কথা দ্রৌপদীরও শ্রুতিস্পর্শ করিল। কেহ বলিল,—ইনি সূতপুত্র; কেহ অবজ্ঞার সুরে কহিলেন,—কুরুরাজ দুর্য্যোধনের প্রসাদে ইনি হইয়াছেন অঙ্গেশ্বর, কেহ বা অবজ্ঞার সুরে কহিলেন,—রথ চালক অধিরথ ইহার পিতা, নীচও আজ স্পর্দ্ধিত হইয়া পাঞ্চাল রাজকন্যার প্রার্থী হইয়াছে!

কর্ণ এই সময় অনায়াসে কার্ম্মুক জ্যা-যুক্ত করিয়া লক্ষ্যের উদ্দেশে শর-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কর্ণের সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ জনমত দ্রৌপদীর চিত্ত এরূপ বিকৃত করিয়া দিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন,—সূতপুত্রকে আমি বরণ করিতে পারিব না।

স্বয়ম্বরা কন্যার মুখে এরূপ অপমানজনক উক্তি শুনিয়া কর্ণ ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। পক্ষান্তরে দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন যখন আশ্চর্য্য কৌশলে লক্ষ্য ভেদ করিয়া সমবেত রাজন্যসমাজকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন, তখন অর্জ্জুনের গলে বরমাল্য অর্পণ করিতে দ্রৌপদী কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

অতঃপর মনঃক্ষুণ্ণ রাজগণ যখন বলিতে লাগিলেন, স্বয়ম্বর-প্রথা কেবল ক্ষত্রিয়ের পক্ষেই শাস্ত্রসিদ্ধ; সুতরাং এই কন্যা যদি আমাদের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত না করে, তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে চলিয়া যাইব; তখনও দ্রৌপদীর মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই।

অর্জ্জুনের গলায় বরমাল্য প্রদানের পর মাতৃনির্দ্দেশে যে বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল, মাতৃবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে স্বয়ং অর্জ্জুনও যখন অপূর্ব্ব ত্যাগের পরিচয় দিলেন, দ্রৌপদী তখন পঞ্চ ভ্রাতার এই অনন্যসাধারণ সৌভ্রাতৃত্ব দেখিয়া স্বেচ্ছায় শ্বশ্রূদেবীর ইচ্ছার অনুকূলে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারেন নাই! সুশিক্ষিতা রাজকুলোদ্ভবা তরুণী কন্যার এই যে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, ইহার আর উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শ্বশ্রূদেবীর নির্দ্দেশকেই তিনি ভবিতব্যের বিধান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

বিপদেও দ্রৌপদী কোন দিন ভয়বিহ্বলা নহেন। প্রতিকামী দুর্য্যোধনের আদেশে অন্তঃপুরে গিয়া যখন দ্রৌপদীকে জানাইল, যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া আপনাকে পণ রাখিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাহাতে জয়ী হইয়া আপনাকে সভায় আহ্বান করিতেছেন।

তখন দ্রৌপদী স্তব্ধ হইয়াই কথাটা শুনিলেন, কিন্তু অধৈর্য্য হইলেন না; তিনি অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করিয়া প্রতিকামীকে কহিলেন,—

কথং ত্বেবং বদসি প্রতিকামিন্ কো বৈ দীব্যেদ্ভার্য্যায়া রাজপুত্রঃ।
মূঢ়ো রাজা দ্যূতমদেন মত্তো হ্যভূন্নান্যং কৈতবমস্য কিঞ্চিৎ॥

অর্থাৎ,—হে প্রতিকামিন্, তুমি কি প্রলাপ বকিতেছ? কোন রাজপুত্র পত্নীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করে? যুধিষ্ঠিরের কি আর সম্পত্তি ছিল না?

কিন্তু প্রতিকামী যখন জানাইল যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যথাসর্ব্বস্ব পণে হারাইয়া পরিশেষে আপনাকে দ্যূত-মুখে সমর্পণ করিয়াছেন, তখনও দ্রৌপদী অবিচলিতা ; তিনি বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া প্রতিকামীকে কহিলেন,—

গচ্ছ ত্বং কিতবং গত্বা সভায়াং পৃচ্ছ সূতজ।
কিন্নু পূর্ব্বং পরাজৈষীরাত্মানমথ বা নু মাম্॥ আ প, ৬৩৭

অর্থাৎ—হে সূতনন্দন, তুমি সভায় গমন করিয়া সেই দ্যূতক্রীড়াসক্তকে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে পণ রাখিয়াছিলেন।

প্রতিকামীর মুখে দ্রৌপদীর এই প্রশ্ন শুনিয়া সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত ; কিন্তু যুধিষ্ঠির অধোমুখেই বসিয়া রহিলেন ; তাঁহার নিকট হইতে প্রশ্নের কোন উত্তর আসিল না। দুর্য্যোধনের ইচ্ছা নয়, এই অপ্রত্যাশিত বিচার-ব্যাপারে কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। তিনি প্রতিকামীকে তিরস্কার করিলেন।

অতঃপর দুর্য্যোধনের আদেশে দুর্ম্মতি দুঃশাসন যখন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভাস্থলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং এই নিদারুণ অনাচার দৃষ্টে সভাস্থ সকলে মর্ম্মবেদনায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন, প্রকীর্ণকেশা ও স্খলিতার্দ্ধবসনা বীরাঙ্গনা দ্রৌপদী তখন যেন যুগপৎ লজ্জা ও ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

ইমে সভায়ামুপদিষ্টশাস্ত্রাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সর্ব্ব এবেন্দ্রকল্পাঃ।
গুরুস্থানা গুরুবশ্চৈব সর্ব্বে তেষামগ্রেনোৎসহে স্থাতুমেবম্॥
নৃশংসকর্ম্মংস্ত্বমনার্য্যবৃত্ত মা মাং বিবস্ত্রাং কুরুমা বিকার্ষীঃ।
ন মর্ষয়েয়ুস্তব রাজপুত্রাঃ সেন্দ্রাহি দেবা যদি তে সহায়াঃ॥

সভা, প, ৬৩।৩৫।৩৬

অর্থাৎ—রে নৃশংসাচারী, এই সভায় সমবেত অধীতশাস্ত্র ক্রিয়াবন্ত

রাজগণ সকলেই ইন্দ্রকল্প এবং আমার গুরু স্থানীয়, সুতরাং এ অবস্থায় ইহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইতে আমি নিরুৎসাহ হইতেছি। ওরে অনার্য্যচরিত নিরস্ত হ। যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে ক্ষমা করিবেন না।

কিন্তু দ্রৌপদীর এরূপ জলন্ত বাক্যেও যখন সভাস্থ কেহই কোন প্রতিবাদ তুলিলেন না, বা দুঃশাসনকে নিবারণ করিলেন না, তখন অভিমানিনী বীরাঙ্গনা মর্ম্মভেদী স্বরে কহিলেন,—

ধিগস্তু নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্।
যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্ম্মবেলাং প্রেক্ষন্তি সর্ব্বে কুরবঃ সভায়াম্॥

সঃ পঃ ৬৩।৩৯-৪

হায়! সমুদায় কৌরবগণ যখন সভামধ্যে অবলীলাক্রমে স্বধর্ম্মের সীমা উল্লঙ্ঘিত হইতে দেখিতেছেন, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভারতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে এবং ক্ষত্রধর্ম্মীদিগের চরিত্রও দূষিত হইয়াছে। দ্রৌপদীর এই মর্মভেদী বাক্যেও যখন সকলে নির্ব্বাক রহিলেন তখন দুর্যোধনের অনুজ তরুণবয়স্ক বিকর্ণ করুণাপরবশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,— দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের ভার্য্যা, সুতরাং যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কি প্রকারে একাকী পণ রাখিতে পারেন? সুতরাং দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ ধন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বিকর্ণের কথা শুনিয়া সভাস্থ অনেকেই সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন,—পাণ্ডবদের যাহা কিছু আছে সমস্তই ধর্মত জয় করা হইয়াছে, অতএব উহাদের সহিত দ্রৌপদীর বসনগুলিও কাড়িয়া লও।

"পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাংসি দ্রৌপদ্যাশ্চাপ্যুপাহর।"

এই কথা শুনিবামাত্র পাণ্ডবগণ শশব্যস্তে স্ব স্ব উত্তরীয় গাত্র হইতে

উত্তরণ করিয়া প্রদান করিলেন। কিন্তু দ্রৌপদী একবস্ত্রেই সভায় আনীতা হইয়াছিলেন, দুঃশাসন তাঁহাকে অঙ্গাচ্ছাদনের জন্য উত্তরীয় ধারণের অবসর দেন নাই। সভায় আসিয়া লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া এ পর্য্যন্ত দ্রৌপদী ক্রোধদৃপ্ত ভঙ্গীতে গ্রীবা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধনের এই সাংঘাতিক আদেশ দুঃশাসনকে যেমন পুনরুত্তেজিত করিয়া তুলিল, অমনি নারীত্বের লাঞ্ছনার আতঙ্ক সেই অপাপবিদ্ধা সাধ্বীর তেজোদৃপ্ত অন্তরটি যেন মথিত করিয়া দিল। এ অবস্থায় তিনি আর তাঁহার নির্জ্জিত পতিগণের নিকট সহায়তাপ্রার্থী হইলেন না, সভাস্থ কুরুবৃদ্ধগণের উদ্দেশেও কোন প্রার্থনা করিলেন না; দুর্ব্বৃত্ত নরপশুর করাল গ্রাস হইতে লজ্জারক্ষার জন্য অগতির গতি অসহায়ের সহায় আর্ত্তের ত্রাতা অনাথের বন্ধু গোবিন্দের শরণাপন্ন হইয়া আর্ত্তস্বরে অন্তর্নিহিত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন,—

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
হে নাথ! হে রমানাথ! ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
কৌরবার্ণবামগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥

সভাঃ পঃ ৬৮।৪১-৪৩

অশ্রুমুখী দ্রৌপদীর এই আকুল প্রার্থনায় সভায় তুমুল কলরব উঠিল। অন্তর্হিত ধর্ম্ম যেন এতক্ষণে সভায় আবির্ভূত হইলেন। এ পর্য্যন্ত যাঁহারা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া নীরবে এই অনাচার দেখিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দুঃশাসনের হস্ত হইতে দ্রৌপদীর বসনাঞ্চল স্খলিত হইল।

পড়িল। ধর্ম্ম যেন অপূর্ব্ব আচ্ছাদনী বস্ত্ররাজির দ্বারা দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এই চাঞ্চল্যকর অবস্থার মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরেও চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি এই সাংঘাতিক অবস্থার গতি পরিবর্ত্তনের জন্য দ্রৌপদীকে নিকটে আহ্বান করিয়া অভিলষিত বর গ্রহণ করিতে বলিলেন।

দ্রৌপদী শ্বশুরের নিকট যে বর প্রার্থনা করিলেন তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। তিনি পতিগণের স্বাধীনতা প্রার্থনা করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিলেন।

ফলতঃ পাণ্ডবদিগের দাসত্ব মুক্তির উপলক্ষ হইয়াছিলেন দ্রৌপদী। এই জন্যই কর্ণ উপহাসপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন,—স্ত্রীলোকের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তরণীস্বরূপ হইয়া পতিগণকে বিপদ্‌সাগর হইতে একমাত্র দ্রৌপদীই উদ্ধার করিলেন!

ধৃতরাষ্ট্র সাতিশয় প্রীত হইয়া দ্রৌপদীকে আরও বর লইবার জন্য অনুরোধ করিলে দ্রৌপদী দৃঢ়স্বরে বলিয়াছিলেন,—

লোভো ধর্ম্মস্য নাশায় ভগবন্নাহমুৎসহে।
অনর্হা বরমাদাতুং তৃতীয়ং রাজসত্তম॥

দ্বিতীয় অক্ষক্রীড়ায় পরাজয়ের পর সর্ত্তানুসারে পাণ্ডবগণ যখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া বনগমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, আমরা দেখিতে পাই, দ্রৌপদী অন্তঃপুরে কুন্তীর সন্নিকটে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এবং কৌরব-বধূদিগকে বন্দনা ও আলিঙ্গন করিয়া পতিগণের অনুগমন প্রার্থনা করিতেছেন।

ইহার পর আমরা দেখিতে পাই, বস্ত্রাভরণবিহীন অজিনধারী পঞ্চপাণ্ডবের অনুসরণ করিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন পঞ্চপাণ্ডবের হৃদয়েশ্বরী একবস্ত্রা মুক্তবেণী দ্রৌপদী।

রাজকন্যা, রাজবধূ হইয়াও দ্রৌপদী সকল বিষয়েই অসামান্য সহনশীলা ও শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন। সম্রাজ্ঞীরূপে একদা যিনি সিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করিতেন, কাম্যক বনে উপস্থিত হইয়া নিপুণ হস্তে এমন পরিপাটী রূপে তিনি পঞ্চপতি ও আশ্রমে সমাগত বহুসংখ্যক অতিথির সেবা পরিচর্য্যা করিতেন যে, সত্যই তাহার উপমা মিলিত না। রন্ধনে তাঁহার এরূপ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ পাইত যে, আশ্রমে আসিয়া কেহই কোনদিন অভুক্ত হইয়া ফিরিতেন না। সকলকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া রন্ধনশালার শেষ খাদ্যটুকু তিনি প্রচুর পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিতেন। দ্রৌপদীর এই আতিথেয়তা ও রন্ধননিপুণতার কাহিনী দুর্য্যোধনের কর্ণগোচর হইলে তিনি একদা কৌশলপূর্ব্বক অভুক্ত অবস্থায় কোপনস্বভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে সশিষ্য অসময়ে বনমধ্যে পাণ্ডবাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধ্বী দ্রৌপদীর যে অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা কুরুসভায় আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার লজ্জা রক্ষা করিয়াছিল, এই সঙ্কট সময়েও সেই নিষ্ঠা তাঁহাকে অতিথিসংকারের সামর্থ্য দিয়াছিল।

দ্বৈতবনে যে সময় পাণ্ডবগণ বনবাসব্রত পালন করিতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে তাঁহার প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী সত্যভামাদেবীর সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দেবী সত্যভামা বনবাসেও পাণ্ডবগণকে পরম সুখী এবং দ্রৌপদীকে সর্ব্বক্ষণ প্রীতিপ্রসন্ন দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগিনি, কোন্ ব্রত, মন্ত্র বা ঔষধের দ্বারা তুমি তোমার পঞ্চপতিকে এরূপ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছ, তাহা আমাকে বল; তাহা হইলে আমিও সেই উপায়ে কৃষ্ণকে আত্মবশে আনিয়া অনুরূপ সৌভাগ্যবতী হইব।

পতিব্রতা দ্রৌপদী ইহার উত্তরে কহিলেন,—ভগিনি, অতি সাধারণ ও হীন স্ত্রীগণই পতিকে বশীভূত করিতে ঐরূপ নিন্দিত উপায় অবলম্বন

করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ভার্য্যা হইয়া এরূপ প্রশ্ন করা তোমার উচিত হয় নাই। মন্ত্র বা ঔষধে স্বামীকে কদাচ বশ করা যায় না। আমি যে ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি পাণ্ডবদিগের অন্যান্য স্ত্রীগণের প্রতি কখন অসদ্ব্যবহার করি না, নিরভিমান চিত্তে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। সকলকেই আমি সমানভাবে সেবা করি এবং দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ সম্বন্ধে সদাই সতর্ক থাকি। বাসগৃহ আমি সর্ব্বক্ষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি এবং নিয়মিত সময়ে স্বামিগণের ভোজন সম্পর্কে সচেতন থাকি। ইহা ভিন্ন নিজেও যথাসম্ভব রমণীয় বেশভূষণ ও মনোহর গন্ধমাল্যে সুসজ্জিত ও সদাপ্রসন্ন থাকিতে চেষ্টা করি।

সত্যভামা তখন নিজের ভ্রম বুঝিয়া কহিলেন,—ভগিনি, আমার অপরাধ হইয়াছে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

দ্রৌপদী কৌতুকছলে যে কথাগুলি একদিন শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী সত্যভামা দেবীকে বলিয়াছিলেন, আজ আমাদের দেশের মা-লক্ষ্মীরা যদি ঐ কথাগুলির অনুসরণ করেন, বর্ত্তমানের জীবন যাত্রায় তাঁহারাও সত্যভামার মত সত্যের সন্ধান পাইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু এরূপ সহনশীলা মহীয়সী নারীরত্নের পশ্চাতে লাঞ্ছনা-রাক্ষসীও যেন সুযোগ প্রতীক্ষায় লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল। সে সুযোগ একদা অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিল।

পাণ্ডবগণ যে সময় কাম্যক বনে বাস করিতেছিলেন তখনই এই ঘটনা ঘটে। একদা দ্রৌপদীকে পুরোহিত ধৌমের আশ্রয়ে মহর্ষিতৃণবিন্দুর আশ্রমে রাখিয়া চারি পাণ্ডব মৃগয়া উপলক্ষে অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন। অর্জ্জুন এ সময় শস্ত্র সাধনায় হিমাচল প্রদেশে তপস্যা রত ছিলেন। ঘটনাচক্রে ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ পুনরায় বিবাহার্থী হইয়া সেনাদল ও সহচরবৃন্দের সহিত কাম্যকবনের তাপসাশ্রমের পার্শ্ব

দিয়া শাল্ব রাজের রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন।

সৌদামিনী যেরূপ নীল জলধরকে উজ্জ্বল করিয়া রাখে, দ্রৌপদী তদ্রূপ সেই নিবিড় বনকে আলোকময় করিয়া আশ্রমের দ্বারে একটি অবনত কদম্ব শাখায় দেহটি আশ্রয় পূর্ব্বক শর্ব্বরী-পবন-কম্পিত অগ্নিশিখার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি রথারোহী জয়দ্রথের নেত্রপথ-বর্ত্তিনী হইলেন।

সপারিষদ জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং অরণ্যমধ্যে এরূপ রূপবতী রমণীর আবির্ভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য কোটিকাস্য নামে এক সহচরকে প্রেরণ করিলেন। দ্রৌপদী তাহাকে আশ্রমদ্বারে দেখিবামাত্র কদম্বশাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসনাদি সংযত করিয়া অতিথির অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হইলেন। অতঃপর তাহার মুখে জয়দ্রথের পরিচয় পাইয়া তিনি উল্লসিত ভাবে কহিলেন,—আমি দ্রুপদ-রাজার কন্যা পাণ্ডবগণের সহধর্ম্মিণী; এক্ষণে তাঁহারা বনমধ্যে মৃগয়া উপলক্ষে গমন করিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিবেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, অপ্রত্যাশিতভাবে আশ্রমে আজ পরমাত্মীয় স্থানীয় অতিথির শুভাগমন হইয়াছে। আপনি সত্বর সিন্ধুরাজকে আশ্রমমধ্যে আনয়ন করুন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।

কথাগুলি বলিয়াই দ্রৌপদী ব্যস্তভাবে রাজ-অতিথির সংকারের জন্য আশ্রম-কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে জয়দ্রথও কোটিকাস্যের মুখে দ্রৌপদীর পরিচয় পাইয়া পরমানন্দে আশ্রমমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

দণ্ডকারণ্যে জনকনন্দিনী সীতাকেও একদিন স্বামীর অনুপস্থিতিতে এইভাবে সঙ্কোচশূন্য অন্তরে আশ্রমদ্বারে সমুপস্থিত অতিথির সংকারে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। বনমধ্যে আশ্রমদ্বারে পরমাত্মীয়কে অতিথির মর্য্যাদা দিয়া সংকারের আনন্দ লাভ পাণ্ডববনিতার পক্ষে স্বাভাবিক।

জয়দ্রথকে দেখিয়া অসঙ্কোচেই তিনি তাঁহার সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন,—হে রাজন্! আপনার রাজ্য, কোষ ও বলের মঙ্গল ত? আপনাদের উপস্থিতিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। উপস্থিত আপনারা পাদ্য, আসন এবং ভোজনের নিমিত্ত ফলমূলাদি গ্রহণ করুন। পাণ্ডবগণ প্রত্যাগমন করিলে আহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে।

দ্রৌপদীর পরিচয় পাইয়াই জয়দ্রথ মনে মনে যে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন, তাহাই এখন প্রকাশ করিয়া আশ্রমধর্ম্ম পালনে নিষ্ঠাবতী দ্রৌপদীকে স্তব্ধ করিয়া দিলেন। তিনি নির্লজ্জের মত কহিলেন,—হে, সুন্দরী! তোমার কথাতেই আমি তৃপ্ত হইয়াছি। পাদ্য, আসন বা আহার্য্যের আর আবশ্যক নাই, আমি তোমাকেই চাই। তুমি শ্রীহীন পাণ্ডবদিগের সংস্রব ত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যাত্ব স্বীকার কর; সমগ্র সিন্ধু সৌবীররাজ্য তোমার পদানত হইবে।

এতক্ষণ যে নারীর মুখমণ্ডল আত্মীয় দর্শন ও অতিথিসংকারের আনন্দে উৎফুল্ল রহিয়াছিল, জয়দ্রথের এই অশিষ্ট কথায় মুহূর্ত্তে তাহা আরক্ত ও ভ্রুকুটি-কুটিল হইয়া উঠিল।

আশ্রমমধ্যে একাকিনী সীতা ছদ্মবেশী রাবণের পরিচয়ের সহিত তাহার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া যে ভাবে নির্ভীকচিত্তে তর্জ্জনের সুরে তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, দ্রৌপদীও তেমনই জলন্তদৃষ্টিতে জয়দ্রথের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন,—রে দুরাত্মা, তোর কি লজ্জা বোধও নাই?

জয়দ্রথের সম্মুখে অবস্থিতিও তিনি যেন এবার নিদারুণ অপকর্ম্ম মনে করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। কিন্তু জয়দ্রথ তাঁহাকে যাইতে দিলেন না, সবলে তাঁহার অঙ্গবস্ত্র ধারণ করিলেন।

দ্রৌপদী তখন ক্রোধ কম্পিত-কলেবরে-উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—

আরে মূঢ়! সদ্বংশজাত হইয়াও তুই পাণ্ডবগণকে এইভাবে অপমান করিতেছিস? অবিবেকী ব্যক্তির মত দণ্ড হস্তে তুই মদমত্ত কুঞ্জরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্! ভীমার্জ্জুনের কথা কি তুই ভুলিয়া গিয়াছিস্।

কিন্তু জয়দ্রথ কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রৌপদীকে সবলে আকর্ষণপূর্ব্বক রথে তুলিয়া লইলেন। এ অবস্থায়ও দ্রৌপদীর মুখে মিনতির একটি কথাও উঠে নাই, যথাশক্তি বাধা দানের সহিত তিনি বজ্রকণ্ঠে এই দুর্দ্ধর্ষ আততায়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

ইহার পর পাণ্ডবদের আক্রমণে সদলবলে পরাজিত জয়দ্রথ সাধ্বী দ্রৌপদীকে ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইলে ভীম নকুল প্রভৃতি তাঁহাকে বন্দী করিয়া দণ্ডদানের জন্য যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত করিলেন, সদাশয় যুধিষ্টির তখন কহিলেন,—জয়দ্রথ অত্যন্ত অপকর্ম্ম করিয়াছে, তথাপি মাতা গান্ধারী ও ভগিনী দুঃশলার কথা স্মরণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা উচিত।

কিন্তু স্বামীর এ নির্দ্দেশ দ্রৌপদীর অন্তর স্পর্শ করিল না, তিনি তখন দলিতা ফণিনীর মত নিশ্বাস ফেলিয়া দৃপ্তস্বরে মহাবল ভীমকে কহিলেন,—এই পাপিষ্ঠকে তোমরা ক্ষমা করিও না; যে ভার্য্যা বা রাজ্য অপহরণ করে, শরণাগত হইলেও সে অবশ্য বধ্য।

কিন্তু মন্দভাগ্য জয়দ্রথ নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ যখন পাণ্ডবদের দাসত্ব স্বীকার করিল, তখন দ্রৌপদীর রোষানলে আহুতি পড়িয়াছে। মুণ্ডিতমস্তক, প্রহারনির্জ্জিত, জয়দ্রথের শ্রীহীন মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি কহিলেন,—এ দুরাচার যখন তোমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, তখন ইহাকে বধ করিবার প্রয়োজন নাই।

অবশ্য, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দাসত্ব হইতেও মুক্তি দিয়াছিলেন।

এই ঘটনা হইতে আমরা এই আদর্শ নারীরত্নের অন্তর্নিহিত ভাব-

ধারার সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাই। নারীসুলভ কোমলতা ও কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি যেমন আচারনিষ্ঠাপরায়না ব্রতচারিণী, পক্ষান্তরে নারীত্বের অপমানকারী অধর্ম্মচারী পাষণ্ডের শাস্তিবিধানে প্রতিহিংসাপরায়ণা ভয়ঙ্করী। বিরাট রাজভবনে তিনি যখন সৈরিন্ধ্রীরূপে অজ্ঞাত বাস করিতেছিলেন, সে সময় রাজশ্যালক ও সেনাপতি মহাবল কীচক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইয়া তাহার শাস্তি বিধানে তাঁহাকে এইরূপই ভয়ঙ্করী হইতে হইয়াছিল। পরগৃহবাসে ও অতিশয় সঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যেও ভীমকে প্ররোচিত করিয়া কীচকের বিরুদ্ধে যে দণ্ড ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন, তাহাতে কীচককে অতি শোচনীয় ভাবে মৃত্যু বরণ করিতে হইয়াছিল।

সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে দ্রৌপদী কীচক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইবার পর সেই রাত্রিতে সূপকাররূপী ভীমসেনকে শয্যায় শায়িত দেখিয়া, দ্রৌপদী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছিলেন,—তুমি কি জীবন পরিত্যাগ করিয়া শয়ন করিয়া আছ! নতুবা জীবিত ব্যক্তির পত্নীকে অপমান করিয়া কীচক কি প্রকারে এখনও জীবিত থাকিতে পারে!

দ্রৌপদীর এই কয়েকটি কথাই ভীমকে কীচক বধে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

অজ্ঞাত বাসের পর পাণ্ডবগণকে প্রতিজ্ঞাপাশমুক্ত দেখিয়াও দুর্য্যোধন যখন তাঁহাদের অধিকার প্রত্যর্পণে সম্মত হইলেন না এবং ইহার প্রতিকারে পতিগণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ সম্পর্কে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে অভিমানিনী দ্রৌপদীর উত্তেজনাপূর্ণ বাণী শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন,—

হে কৃষ্ণ! কৌরব সভায় আমার লাঞ্ছনার সময়ও আমার পতিগন মৃদুভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন; মৃদুভাব অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা

সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। আজ প্রতিজ্ঞা পালনান্তেও তাঁহারা সেই পূর্ব্বানুসৃত মৃদুভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এখন তুমি ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তুমি কৌরব সভায় আমাদের সমগ্র রাজ্যপ্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কোনরূপ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইও না। অন্যথায় যুদ্ধই শ্রেয়ঃ। আমার পতিগণ যদি যুদ্ধে বিমুখ হন, আমার বৃদ্ধ পিতা যুদ্ধ করিবেন, আমার মহাবল ভ্রাতাগণ যুদ্ধ করিবেন, অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া আমার পঞ্চ পুত্র যুদ্ধ করিবে। সন্ধিসর্ত্ত আলোচনার সময় দুশাঃসনের হস্ত কলুষিত আমার এই কেশের কথা তুমি স্মরণ করিও।

অশ্রুমুখী দ্রৌপদীর এই তেজোদৃপ্ত উক্তির উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে তাহা কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

হে কল্যাণি! বাষ্প সম্বরণ কর। অল্পদিনের মধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে এই ভাবে তুমি রোদন করিতে দেখিবে। তোমার পতিগণ অচিরেই শত্রু সংহার পূর্ব্বক রাজ্য লাভ করিবেন।

আবার এই দ্রৌপদীকে আমরা দেখিতে পাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর মহাদেবী গান্ধারীর বিলাপে আকুল হইয়া তাঁহার পদতলে বসিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিতেছেন, আর্য্যে! অভিমন্যু ও আমার পুত্রগণ কোথায়?

দ্রৌপদীর অশ্রুসিক্ত মুখের এই একটি প্রশ্নেই মহাদেবী গান্ধারী শতপুত্রের শোক ভুলিয়া দ্রৌপদীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছিলেন।

বস্তুতঃ ঔজ্জ্বল্যে মাধুর্য্যে, কোমলতায় কাঠিন্যে, শৌর্য্যে কারুণ্যে প্রতিহিংসায় ক্ষমায়, দ্রৌপদী-চরিত্র অনুপম। বিধাতা যেন ওজন করিয়াই পঞ্চপাণ্ডবের কর্ম্মময় অপূর্ব্ব জীবন-তরুর উপযুক্ত আবেষ্টনীরূপে দ্রৌপদীর ন্যায় আদর্শ লতাটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

উত্তরা

মৎস্যরাজ বিরাটের এই সুদর্শনা কন্যাটি মহাভারতের বিরাট অঙ্কে যে স্থানটুকু পাইয়াছেন, তাহা পর্য্যাপ্ত না হইলেও, যেমন স্বতন্ত্র, তেমনই একটা বৈশিষ্ট্যও তাহার আছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মহাভারতের পাঠকপাঠিকাদের মানসপটে পতিবিয়োগ-বিধুরা এই বধূটির বিষাদপ্রতিমা ছবির মত প্রতিফলিত হইয়া বেদনার সর্ব্বাধিক গভীর রেখাপাত করে।

বনবাস অন্তে পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বিরাটরাজ ভবনে ছদ্ম পরিচয়ে সম্বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন তৎকালে উত্তরাকে সঙ্গীত ও নৃত্যাদি শিক্ষা দিতেন। ইতিমধ্যে কুরুরাজ দুর্য্যোধন সসৈন্য রাজা বিরাটের বিপুল গোধন লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে গো-গৃহ আক্রমণ করিলে সৈরিন্ধ্রীরূপিনী দ্রৌপদীর কৌশলে অর্জ্জুন হিতকারী রাজার গোধন রক্ষার্থ যুদ্ধকামী রাজপুত্র উত্তরের সারথ্য স্বীকারে বাধ্য হন। উত্তরা এই সময় যুদ্ধযাত্রী ভ্রাতা এবং শিক্ষাগুরু বৃহন্নলার নিকট আব্দার করেন যে, যুদ্ধে পরাজিত কৌরবদের বস্ত্রাভবরণগুলি যেন তাঁহাকে আনিয়া দেওয়া হয়; তিনি তদ্দ্বারা তাঁহার পুতুলগুলির অঙ্গসজ্জা করিবেন। পথে অর্জ্জুন ভয়বিহ্বল উত্তরকে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাকেই রথচালনার ভার দেন এবং দুর্ব্বার অস্ত্রের প্রভাবে কৌরবগণকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া উত্তরার আব্দার রক্ষা করেন। ঐ যুদ্ধের পূর্ব্বেই অজ্ঞাতবাসের কাল অতীত হইয়াছিল। পুত্রের মুখে পাণ্ডবগণের পরিচয় পাইয়া রাজা বিরাট সসম্মানে

পঞ্চ পাণ্ডব ও তাঁহাদের মহিষী দ্রৌপদীর অর্চনা করিয়া অর্জুনের হস্তে কন্যা উত্তরাকে সম্প্রদান করিতে সমুৎসুক হন। কিন্তু অর্জুন তাঁহার শিষ্যাকে কন্যাস্থানীয়া স্বীকার করিয়া পুত্র অভিমন্যুর সহিত তাহার বিবাহে সম্মতি দেন। মহাসমারোহে বিরাট-রাজ্যে এই বিবহোৎসব সম্পন্ন হয়। এই বিবাহকে উপলক্ষ করিয়া পাণ্ডবের শুভানুধ্যায়ী রাজন্যবর্গ মৎস্যরাজ্যে উপনীত হইয়া তাঁহাদের অন্তর্নিহিত আনন্দের সহিত প্রচুর ধনরত্ন নববধূকে উপহার প্রদান করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অভিমন্যু যখন নিহত হন, উত্তরা তখন গর্ভবতী। তরুণ যৌবনে অভাগিনী সতীকে অকালবৈধব্য বরণ করিয়া লইতে হয়। যুদ্ধান্তে পাণ্ডববংশ-ধ্বংসকামী অশ্বত্থামা তাঁহার মন্ত্রপূত অব্যর্থ অস্ত্র উত্তরার গর্ভস্থ শিশুর উদ্দেশে প্রয়োগ করিয়া চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। পাণ্ডবগণ যে সময় অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী, তৎকালে উত্তরা এক মৃতকল্প শিশু প্রসব করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সময়োচিত সহায়তায় সে শিশু পুনর্জ্জীবন লাভ করে। সেই শিশুই পরিক্ষিৎ—পাণ্ডবদের বংশধর।

মহাভারতে উত্তরার ইহাই পরিচয়, তাঁহার কথা এবং জীবনকাহিনী। কিন্তু কাহিনীটুকুর পরিবেশে উত্তরার স্থান ও সংযোগ স্বল্প হইলেও, তাহা কিরূপ মর্ম্মস্তুদ আমরা তাহার আলোচনা করিব।

মহাভারতের বিরাট পর্ব্বে দশম অধ্যায়ে আমরা সর্ব্বপ্রথম মৎস্যরাজ-সভায় বিরাট রাজার তরুণী কন্যা উত্তরার পরিচয় পাই। এই সভায় বৃহন্নলারূপী অর্জুন রাজা বিরাটকে বলিতেছেন—মহারাজ! আমি নৃত্য গীত ও বাদ্য করিয়া থাকি; এ সকল বিষয়ে আমার বিলক্ষণ পারদর্শিতা আছে। অতএব আপনি আমাকে আপনার পুত্র বা কন্যা জ্ঞান করিয়া রাজকুমারী উত্তরার শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করুন।

রাজা বিরাট যে উত্তর দেন, তাহাতেও উত্তরার প্রসঙ্গ আছে। তিনি

বিশেষভাবে পরীক্ষার পর অর্জ্জুনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন—তুমি আমার কন্যা উত্তরা ও অন্যান্য কুমারীগণকে তৌর্য্যত্রিক বিদ্যা শিক্ষাদান কর।

আর আমরা উত্তরাকে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পাই, এই পর্ব্বের সপ্ত. ত্রিংশ অধ্যায়ে—

সা প্রাদ্রবং কাঞ্চনমাল্যধারিণী জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতা প্রহিতা যশস্বিনী।
সুদক্ষিণা বেদিবিলগ্নমধ্যা সা পদ্মপত্রাভনিভা শিখণ্ডিনী ॥
তন্বী শুভাঙ্গী মণিচিত্রমেখলা মৎস্যস্য রাজ্ঞো দুহিতা শ্রিয়া বৃত।
তন্নর্ত্তনাগার মরাল পক্ষ্মা শতহ্রদামেঘামিবান্ব পদ্যত ॥
সা হস্তিহস্তোপমসংহিতোরুঃ বন্দিতা চারুদতী সুমধ্যমা।
আসাদ্য তংবৈ বরমাল্যধারিণী পার্থং শুভা নাগবধূরিব দ্বিপম্ ॥
সা রত্নভূতা মনসঃ প্রিয়ার্চ্চিতা সুতা বিরাটস্য মহেন্দ্র লক্ষ্মীঃ।
সুদর্শনীয়া প্রমুখে যশস্বিনী প্রীত্যাব্রবীদর্জ্জুনমায়তেক্ষণা ॥

বিরাট পর্ব্ব ৩৭।১—৩

অর্থাৎ—সেই কাঞ্চনমাল্যধারিণী, যশস্বিনী, সুচতুরা, ক্ষীণমধ্যা, কুটিলনেত্রলোমা, লক্ষ্মীর ন্যায় বিরাজমানা, ময়ূরপিচ্ছভূষণা, কৃশাঙ্গী, শুভাঙ্গী মণিচিত্রিতকাঞ্চিদামশোভিতা, শ্রীপরিবৃতা মৎস্যরাজ-দুহিতা জ্যেষ্ঠ্য সোদর কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া মেঘমণ্ডলসন্নিহিতা বিদ্যুল্লতার ন্যায়, দ্রুতপদসঞ্চারে সেই নৃত্যাগারে উপনীতা হইলেন।

ইহার পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, গোপাধ্যক্ষের মুখে রাজপুত্র উত্তর সংবাদ পাইয়াছেন, কৌরবগণ মৎস্যরাজের রক্ষিত ষষ্ঠ সহস্র গোধন বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন। স্ত্রী-সমাজের মধ্যে এই দুঃসংবাদ পাইয়া উত্তর শ্লাঘাপূর্ব্বক কহিলেন—বড়ই দুঃখের কথা, পিতা বিদর্ভ রাজ্যের আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে রথী সারথি সমস্তই লইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি আমার নিজের সারথিও নিহত হইয়াছে। আমি যদি একজন

উপযুক্ত সারথী পাইতাম, তাহা হইলে কৌরবগণ আমার বাহুবলের পরিচয় পাইত।

সৈরিন্ধ্রীবেশী দ্রৌপদী এই কথা শুনিয়া উত্তরকে বলিলেন—রাজান্তপুরের নৃত্যাগারে বৃহন্নলা নামে যে নপুংসক রাজকন্যাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দেন, তিনি একজন উপযুক্ত সারথি। কিছুকাল মহাবীর অর্জুনের সারথ্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, আমি তাহা ভালরূপ জ্ঞাত আছি।

উত্তর বলিলেন—তুমি যেন জ্ঞাত আছ, কিন্তু আমি কেমন করিয়া সেই স্ত্রীবেশধারীকে সারথি হইবার জন্য অনুরোধ করিব?

দ্রৌপদী বলিলেন—আপনার ভগিনী রাজকুমারী উত্তরা তাঁহাকে বলিলে, নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার কথা রক্ষা করিবেন।

সৈরিন্ধ্রীর কথা শুনিয়া উত্তর ভগিনী উত্তরাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি সত্বর নৃত্যশালায় গিয়া বৃহন্নলাকে আনয়ন কর।

তদনুসারেই নৃত্যশালায় এরূপ উৎকণ্ঠিতভাবে উত্তরার আবির্ভাব। তাঁহাকে দেখিয়া অর্জুন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজকুমারী! আজ তোমাকে এমন চিন্তিত দেখিতেছি কেন? আমার নিকট এত দ্রুতপদ সঞ্চারে আসিবার কারণ কি?

উত্তরা বলিলেন—

গাবো রাষ্ট্রস্য কুরুভি কাল্যন্তে নো বৃহন্নলে।
তান্ বিজেতুং মম ভ্রাতা প্রয়াস্যতি ধনুর্দ্ধরঃ॥
নাচিরং নিহতস্তস্য সংগ্রামে রথ সারথিঃ।
তেন নাস্তি সমঃ সূতো যোহস্য সারথ্য মাচরেৎ॥
তস্মৈ প্রযতমানায় সারথ্যার্থং বৃহন্নলে।
আচচক্ষে হয় জ্ঞানে সৈরিন্ধ্রী কৌশলং তব॥
সা সারথ্যং মম ভ্রাতুঃ কুরু সাধু বৃহন্নলে।
পুরা দূরতরং গাবো হ্রিয়ন্তে কুরুভিহি নঃ॥ ৩৭।৮-১১

হে বৃহন্নলা! কৌরবগণ আমাদের রাজ্যের গোধনসমূহ অপহরণ করিয়াছে। কিছুদিন হইল আমার ভ্রাতার সারথি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে, সুতরাং তিনি সারথির অভাবে যুদ্ধে গমন করিতে পারিতেছেন না। সৈরিন্ধ্রী বলিল, তুমি পূর্ব্বে সারথীর কার্য্য করিয়াছ; অতএব এক্ষণে ভ্রাতার সারথ্য স্বীকারপূর্ব্বক আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর।

বৃহন্নলাকে স্বীকৃত করিয়া ভ্রাতার নিকট লইয়া গেলে যখন রণযাত্রার আয়োজন চলিতে থাকে, সেই সময় আমরা রাজকুমারী উত্তরার মুখে বৃহন্নলার উদ্দেশে এইরূপ অনুরোধ শুনিতে পাই—

বৃহন্নলে আনয়েথা বাসাংসি রুচিরাণিচ

বিজিত্য সংগ্রমগতান্ ভীষ্ম দ্রোণমুখান্ কুরূন্ ৩৭।২৭—২৮

অর্থাৎ—হে বৃহন্নলা! ভীষ্ম দ্রোণাদিকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের উত্তরীয় বসন আমাদের পুত্তলিকার নিমিত্ত আনয়ন করিও।

বৃহন্নলাবেশী অর্জ্জুন উত্তরে বলেন, রাজকুমার যদি কৌরবগণকে পরাজয় করেন, তবে আমি অবশ্য তাঁহাদের বিচিত্র উত্তরীয় বসন-সকল আনয়ন করিব।

পাণ্ডব-প্রকাশের পর উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের উদ্যোগে এবং পাণ্ডবগণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে বিপুল সমারোহে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই শুভ বিবাহের পরেই মহাভারতের মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইল। সুতরাং নব বরবধূর মিলনানন্দ আসন্ন সমরায়োজনে বিপুল উত্তেজনার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিল।

ইহার পর মহাভারতকার উত্তরাকে যে অবস্থায় আমাদের সম্মুখে আনিয়াছেন, তাহা অতিশয় মর্ম্মন্তুদ। তখন কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের

মধ্যাহ্ন কাল, মহারথ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত; শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য কুরুবাহিনীর পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়া দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণে পাণ্ডবপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। যিনি দ্রোণাচার্য্যের এই ব্যূহভেদের কৌশল অবগত সেই অর্জ্জুন নারায়ণী সৈন্যের আহ্বানে ব্যূহের বাহিরে স্থানান্তরে যুদ্ধ লিপ্ত। পাণ্ডবপক্ষের সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু ব্যূহভেদ করিয়া কুরুসৈন্যের ভিতর প্রবেশ করেন। পিতার নিকট তিনি এই ব্যূহ ভেদ পূর্ব্বক প্রবেশ করিবার উপায় শিখিয়াছিলেন, কিন্তু বাহির হইবার সন্ধান জানিতেন না। ফলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি নিহত হন। এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় পাণ্ডব-শিবিরে হাহাকার উপস্থিত হয়। যুদ্ধান্তে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহাবীর অর্জ্জুনও এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদে শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ যে সময় অর্জ্জুনকে স্বতন্ত্র শিবিরাবাসে পুত্র শোকাতুরা সুভদ্রার নিকট লইয়া গিয়া সান্ত্বনা দিতে থাকেন, তখন দ্রৌপদী সদ্য পতিহারা বধূ উত্তরাকে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

অভ্যপদ্যত পাঞ্চালী বৈরাটী সহিতা তদা।
তাঃ প্রকামং রুদিত্বা চ বিলপ্য চ সুদুঃখিতা।
উন্মত্তবত্তদা রাজন্নিঃ সংজ্ঞান্যপতম্ স্থিতৌ ॥

দ্রোঃ প, ৭৬,৩৬।৩৭

উত্তরার মুখে কোন কথা নাই, কিন্তু মূর্ত্তিমতী শোকের মত তাঁহার আবির্ভাবেই সেই শিবির কক্ষের কয়টি প্রাণীর শোক পুনরো-চ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা সকলে শোকাবেগে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অভিমন্যুর শোকে যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন সুভদ্রাদি প্রত্যেকেরই উচ্ছ্বসিত বিলাপ এই পর্ব্বে আমাদিগকে অভিভূত করিয়া থাকে,

কিন্তু পাণ্ডববংশের দুলাল, আবালবৃদ্ধবনিতার প্রিয়পাত্র, প্রিয়দর্শন বীর অভিমন্যুর সহধর্ম্মিনী সদ্যবিধবা অভাগিনী তরুণী উত্তরার মুখের কোন বিলাপবাণী মহাভারতের এই সর্ব্বাধিক করুণ পর্ব্বটির পৃষ্ঠায় মহাভারত-কার লিপিবদ্ধ করেন নাই, শুধু সেই মূর্ত্তিমতী শোক-প্রতিমাটিকে পাঞ্চালীর সহিত শোকমথিত-দেহ শ্বশুর ও শ্বশ্রূর সমক্ষে আনিয়া শোকের চরম চিত্রটি যেন চাকতে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। অবশেষে বাসুদেবের বাণী শোকার্ত্তদের অন্তরে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিল—

অভিমন্যোর্গতিং যান্তু সর্ব্বে তে বৈ মনস্বিনঃ !

যশস্বী অভিমন্যু যে গতি লাভ করিয়াছে, আমরা সকলেই যেন চরমকালে তাহা প্রাপ্ত হই।

ইহার পর স্ত্রী পর্ব্বের বিংশ অধ্যায়ে কুরুবংশের মহিলাগণকে যখন কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে বিলাপ করিতে দেখিতে পাই, তখন গান্ধারীর আর্ত্তস্বরেই আমরা শোকাতুরা উত্তরার অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—

তস্যোপলক্ষয়ে কৃষ্ণ কার্ষ্ণের্রমিততেজসঃ।
অভিমন্যেহ্র্তস্যাপি প্রভা নৈবোপশাম্যতি ॥
এষা বিরাটদুহিতা স্নুষা গাণ্ডীবধন্বনঃ।
আর্ত্তা বালা পতিং বীরং দৃষ্টা শোচত্যনিন্দিতা ॥
তমেষা হি সমাসাদ্য ভার্য্যা ভর্ত্তারমন্তিকে।
বিরাটদুহিতা কৃষ্ণ পানিনা পরিমার্জ্জতি ॥

২০ শ অ, ২-৪ ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, সেই অপরিমিত তেজস্বী অর্জ্জুননন্দন অভিমন্যু হত হইলেও তাহার উজ্জ্বল প্রভা শান্ত হয় নাই দেখিতেছি। এই অনিন্দনীয়া বালিকা বিরাট দুহিতা ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ দুঃখিতা হইয়া

বীরপতিকে দর্শন করিয়া শোক প্রকাশ করিতেছে। হে কৃষ্ণ, অভিমন্যুর ভার্য্যা বিরাটনন্দিনী পতির নিকট উপবিষ্ট হইয়া কোমল করতল দ্বারা পতির অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছে।

এমন কি, শোকাতুরা উত্তরার মর্ম্মবাণীও আমরা এই অধ্যায়ে গান্ধারী দেবীর আর্ত্তবাণীর মধ্য দিয়া শ্রবণ করিয়া থাকি। যথা—

আবেক্ষমাণা তং বালা কৃষ্ণমামভিভাষতে।
অয়ং তে পুণ্ডরীকাক্ষ সদৃশাক্ষো নিপাতিতঃ॥
বলে বীর্য্যে চ সদৃশস্তেজসা চৈব তেঽনঘ।
রূপেণ চ তথাত্যর্থং শেতে ভুবি নিপাতিতঃ॥

অর্থাৎ—হে কৃষ্ণ, এই অবলা নিজ পতিকে নিরীক্ষণ করিয়া তোমাকে বলিতেছে হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার সদৃশ এই পুণ্ডরীকনয়ন নিপতিত হইয়াছেন। হে নিষ্পাপ! যিনি বল বীর্য্যে রূপে ও তেজে তোমার তুল্য ছিলেন, তিনি এখন নিপাতিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

স্বামীর উদ্দেশে এই তরুণী বিধবার মর্ম্মভেদী শোকবাণীও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে দেবী গান্ধারীর বিলাপ-বাক্যেই প্রকাশ পাইতেছে। যথা

তব শস্ত্র জিতাল্লোকান্ ধর্ম্মেণ চ দমেন চ।
ক্ষিপ্রমন্বাগমিষ্যামি তত্র মাং পরিপালয়॥

২০শ অ, ২৩ শ্লোঃ

এতাবানিহ সংবাসো বিহিতস্তে ময়া সহ।
ষাণ্মাসান্ সপ্তমে মাসি ত্বং বীর নিধনং গত॥

২০শ অ, ২৮ শ্লোঃ

অর্থাৎ—হে নাথ! আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা অচিরাৎ তোমার শস্ত্রজিতলোকে অনুগমন করিব। তুমি তথায় আমাকে প্রতিপালন

করিও। হে বীর! ইহলোকে এই ছয় মাস মাত্র তুমি আমার সহিত বাস করিয়া সপ্তম মাসে নিহত হইলে।

মহাভারতের এই সর্ব্বাধিক করুণ চরিত্রটি এভাবে নেপথ্যে থাকিয়াও আমাদের চক্ষুর সমক্ষে সুস্পষ্টভাবেই যেন পরিস্ফুট হইয়া থাকে! মনে হয় যে, বাঙ্গালী সংসারেরই এক নবপরিণীতা তরুণী বধূর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মর্ম্মন্তুদ চিত্রটিই ব্রীড়াবনতা শোকাতুরা পাণ্ডব-বধূ উত্তরার চরিত্রে প্রতিফলিত

অশ্বমেধ পর্ব্বের অষ্টষষ্টি অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই, এই তরুণী বিধবা সদ্যোজাত পুত্রের মৃত্যুতে শোকে অভিভূতা, তখনও তিনি বধূসুলভ ব্রীড়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রে বিজয়লব্ধ সাম্রাজ্যের উপর পাণ্ডবগণের সার্ব্ব-ভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সে সময় মহাসমারোহে অশ্বমেধের আয়োজন চলিয়াছে। সহসা এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা সমগ্র প্রাসাদের উপর বিষাদের ধূম্রাবরণ প্রসারিত করিয়া দিল। ভগিনী সুভদ্রা এবং বধূকে সান্ত্বনা দিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রাসাদ-শুদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই পুত্রশোকাতুরা বধূ অবগুণ্ঠনবতী হইলেন। পরে সেই তপস্বিনী বিরাটনন্দিনী গোবিন্দের উদ্দেশে শোকসন্তপ্ত অন্তরে করুণ বাক্যে বিলাপ করিতে লাগিলেন—'পুণ্ডরীকাক্ষ দেখুন,আমরা পুত্রহীন হইয়াছি। জনার্দ্দন, আমাকেও হত বলিয়া জানিবেন। আমি অবনত মস্তকে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি দ্রোণপুত্র দ্বারা নির্দ্দগ্ধ আমার এই পুত্রকে জীবিত করুন।' পরক্ষণেই তিনি মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'বৎস, উঠ; তোমার পিতার মুখমণ্ডলের ন্যায় ধীমান লোকনাথের পদ্মপলাশলোচনসম্পন্ন বদনমণ্ডল অবলোকন কর।'

কি মর্ম্মস্পর্শী কাতর অভিব্যক্তি শোকাতুরা বধূ উত্তরার! গুরুজনের সমক্ষে তিনি এই প্রথম হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া অন্তরের আবেদন

আবেগময়ী ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। করুণাময় পুরুষোত্তম আর কি স্থির থাকিতে পারেন! তাঁহাকে বলিতে হইল—'সত্য ও ধর্ম যদি আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে অভিমন্যুজাত এই শিশু জীবিত হউক।'

এই খানেই আমরা সাধ্বী উত্তরাকে সম্যক উপলব্ধি করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, বিরাট মহাভারতের মধ্যে সামান্য স্থান পাইয়াও অসংখ্য চরিত্ররাজির মধ্যে এই তপস্বিনী বধূটি কিরূপ অসামান্য। সমগ্র মহাভারত পড়িবার পর আমাদের মানসপটে যে মহিমময়ী মূর্ত্তিটি রূপায়িত হইয়া উঠে, তাহা কুরু-পাণ্ডবের কুল-লক্ষ্মী, রাজতপস্বিনী রাজ-বধূ, রাজ-মাতা উত্তরার! বিপুল শ্রদ্ধায় এই মহীয়সী নারীর উদ্দেশে আমরা মস্তক অবনত করিয়া বলি—তুমি ভারতের নারী, ভারতের ত্যাগ-শীলা সতী, মহাভারতের কথাও কাহিনীর প্রাণস্বরূপিনী তুমি, রাজতপস্বিনী

—সমাপ্ত—